পিটার সিঙ্গার এর নৈতিক মডেলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন: ত্রিমাত্রিক মডেলের প্রাসঙ্গিকতা

ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া[১]

Abstract: *Throughout the article, it has been shown that moral conscience and economic growth are essential for poverty alleviation. To reach into this goal, this article has examined Peter Singer's ethical model of poverty alleviation. But, we find his theory as a trivial and ethically bias notion. Moreover, his analysis would help us to conceptualize the identification point of poverty alleviation. In keeping mind this hypothesis, I offered a triad model of poverty and hunger alleviation which constitutes of three levels: at the first level, the model incorporates Kant's rational approach, Bentham notion of utilitarianism and Singer's notion of reverse utilitarianism. At the second level, it intends to incorporate social values, equality, commitment to people, ensuring entitlement, and provide sufficient incentive to the poor people. And, at the final stage, it incorporates the Marxist equal distribution policy and Sen's capability functionalism. By following this new model, it is possible to alleviate poverty and hunger in a large-scale.*

ভূমিকা

যারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তাদের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব কী। মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদা প্রদর্শন, মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এসব মিলিয়ে যে প্রশ্নটির উদ্রেক করে তা হলো ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কি মানুষের জীবনমূল্যেও স্খলন নয়। এসব প্রশ্ন নিয়ে নীতিদর্শনে ও কল্যাণ অর্থনীতিতে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এইসব ভাবনার ফসল হিসেবে অর্থনীতিবিদ, পলিসি বিশেষজ্ঞ ও নীতিদার্শনিকগণ ভাবছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কীভাবে দূর কর যায়। মানুষের খাদ্য বিষয়ক প্রযুক্তি, উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও এখনও সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে। গত পাঁচ দশকে গোটা পৃথিবীর দরিদ্র্য মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে নাটকীয়ভাবে। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য এক বোতল পানির সমমূল্যের অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার কারণে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে প্রায় দশ মিলিয়ন শিশু। চরমভাবে দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে প্রায় ৮৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ। উক্ত জনগোষ্ঠীর দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের চেয়েও কম। জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় (এসডিজি) দাবি করছে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের করে আনতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এ লক্ষ কীভাবে অর্জিত হবে। উন্নত বিশ্বের অনুদান কিংবা সাহায্যের মাধ্যমে, নাকি নিজেদের সার্মথ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে। যদি সাহায্যের প্রসঙ্গ আসে তাহলে এ সম্পর্কিত বিতর্ককেও পাশ কাটানোর সুযোগ নেই। উন্নত বিশ্বের জনগণ দারিদ্র্য জাতিগোষ্ঠীকে সাহায্য করবে কি-না এটা একান্তই তাদের

1 Singer, Peter, 2009, The Life You Can Save: How to Do Your Part to End World Poverty, New York : Random House Publishing Co.

[১]অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

পছন্দের বিষয়। আবার এটাও দাবি করা হচ্ছে যে, উন্নত বিশ্বের জনগণ যদি পৃথিবীর গোটা জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবেই কেবল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান সম্ভব। সর্বোপরি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সমকালীন বিশ্বের এক জটিল সংকট। এই সংকট নিঃসন্দেহে মানবতারও সংকট। এই সংকটের কারণ ও উত্তরণের বিস্তৃত আলোচনা নিয়ে পিটার সিঙ্গার লিখেছেন : The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty। প্রবন্ধে ক্ষুধা দারিদ্র্য বিষয়ক কয়েকটি বিতর্কের পাশাপাশি পিটার সিঙ্গার প্রস্তাবিত মডেলটি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পরিশেষে সিঙ্গার প্রস্তাবিত মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ থাকে তা কীভাবে অতিক্রম করা যায় সে প্রসঙ্গে বহুত্ববাদী নৈতিক সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে একটি মডেলের প্রস্তাব করা হবে।

দুই

কেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য

প্রথমেই যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে, তা হলো: ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কী মানব সৃষ্ট। নাকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতিতে অনেক ঘটনা ঘটে যার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন, ভূমিকম্প, সুনামি, ঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কী সেরকম কোনো ঘটনা। এ প্রশ্নের একটি যুক্তিযুক্ত বিশেস্নষণের পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কেন হয়। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণসমূহ জানার ক্ষেত্রে আমরা সমালোচনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারি।

আলোচনার সুবিধার্থে তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদগণ যেসব কারণে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংঘটিত হয় বলে দাবি করেন সংক্ষেপে তা নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো যেতে পারে:

ডায়াগ্রাম ১: ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণসমূহ

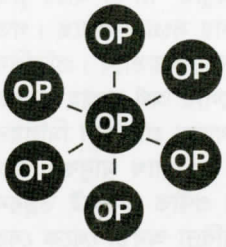

CPH : causes of poverty and Hunger (ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণসমূহ)

OP : (over population) অতিরিক্তি জনসংখ্যা

PE: (problems of entitlement) স্বত্বাধিকারের সমস্যা

FH : (food habit) খাদ্যাভ্যাস

SIJ : (social injustice সামাজিক অবিচার বা অন্যায়

C : (corruption) দুর্নীতি

ID : (income deprivation) আয়-বঞ্চনা

প্রথমত, অতিরিক্ত জনসংখ্যা (over population): অনেক তাত্ত্বিকই মনে করেন, গরীব দেশসমূহের ক্ষুধা দারিদ্রের কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এমনকি অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বিদেশী সাহায্যও যথাযথভাবে কাজ করে না। অতিরিক্ত জনসংখ্যা

সীমিত সুবিধাদির উপর ভাগ বসায়, আর সীমিত সুবিধাদি বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে বণ্টন হয়ে যাবার ফলে জীবন মূল্যমানের অধোগতি হয়। এই অধোগতির কারণে প্রথমত ঐ জনগোষ্ঠী তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি যেমন, স্বাস্থ্যসুবিধা, শিক্ষা সুবিধা বাসস্থানসহ জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনসমুহ অধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বণ্টিত হয়। এতে করে জীবনের গুণগত মানের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। অনেকসময় অতিরিক্ত জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থানের হারও সমন্বয় করা যায় না। ফলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠী খাদ্যের উপর স্বত্বাধিকার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। স্বত্বাধিকার ব্যর্থতার ফলেই অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত সমাজের দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৯৪৩ এর বাংলার মনন্তর নিয়ে উইনস্টন চার্চিল একই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ৪৩ এর মনন্তরের মুল কারণ হলো: "নেটিভদের খরগোশের মতো বংশবৃদ্ধির প্রবণতা"।

দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভ্যাস: তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদগণ দাবি করেন, জনগণের খাদ্যাভ্যাসও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ। এ দাবিটি আমরা লক্ষ করি আইরিশ দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সেই সময়কালের বৃটিশ সরকারের কোষাধ্যক্ষ চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভেলিয়নের মন্তব্য থেকে। তিনি আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেন, আইরিশদের আলু খাবারের প্রতি অতি-আসক্তি দুর্ভিক্ষের কারণ। আলু খাবারের প্রতি এই প্রবণতার ফলে তারা এক ফসলী (শুধু আলু) কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। আলু নিয়ে ট্রেভেলিয়ন বলছেন, "কৃষকদের মধ্যে পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের এমন স্ত্রীলোক বিরল যার রন্ধন কৌশল আলু সিদ্ধ করার চেয়ে বেশি কিছু জানে।" আইরিশ দুর্ভিক্ষ সংঘটনের ঘটনায় এ মন্তব্য প্রমাণ করে তাদের জীবন যাপনে আলু-খাদ্যের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো প্রত্যাশা নেই।

দুর্ভিক্ষ সংঘটনকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আলু উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে কৃষকরা প্রথম কর্মহীন হয়ে পড়ে, আর উৎপাদন কম হবার কারণে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। আর আলু-প্রীতির কারণে অন্যান্য ফসল উৎপাদনের দিকে তাদের কখনোই তেমন কোনো ঝোঁক ছিল না। এসব কারণ দেখিয়ে ট্রেভেলিয়ন রিপোর্ট দাবি করে বিশেষ প্রকার খাদ্যাভ্যাস এই দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল।

এসব তাত্ত্বিকদের মধ্যে গ্যারেট হার্ডিন এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেখুন :

Hardin, Garret, 1968. "The Tragedy of the Commons", in Scince, Vol.162. pp.1243-1248.

Hardin, Garret, 1985. Living on a Lifeboat", in White, James E., (ed.), Comtemporary Moral Philosophy, New York: West Publishing Company, pp.115-128.

Sen, Amartya, 1999. Development As Freedom, Oxford: Oxford University Press.

এ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দেখুন : Smith, Woodham,1962. The Great Hunger: Ireland 1845-1849, Londonn: Hamish Hamilton, p.76.

Sen, Amartya, 1999. chap. Seven : "Famine and other Crisis"

খাদ্যাভ্যাসই কী দর্ভিক্ষের কারণ। এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশের প্রতিনিধি ট্রেভেলিয়ন যে তথ্যের ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের কারণ দেখিয়েছেন তা যথার্থ নয়। এ বিতর্কে অমর্ত্য সেনের অভিমত হলো: বৃটিশদের বক্তব্য দায়িত্বহীন। বৃটিশ উপনিবেশিত অর্থনৈতিক পলিসিই আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষের কারণ। এই অর্থনৈতিক পলিসির আওতায় আইরিশদের খাদ্য ও বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর আত্মনির্ভরশীলতার কেনো সুযোগ ছিল না। খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ট্রেভেলিয়ন যা বলেছেন তাও তথ্যভিত্তিক নয়, কারণ আইরশিদের স্বল্প আহারী প্রবণতা সর্বত্র জানা। তাদের খাদ্য মেন্যুতে যা থাকে তা খুবই পরিমিত। আইরিশ দুর্ভিক্ষর দায়ভার এড়ানোর বৃটিশ অপচেষ্টারই একটি অংশ হলো খাদ্যাভ্যাসকে দায়ী করা। সেসময় আয়ারল্যান্ড কোনো খাদ্য আমদানি দূরের কথা, উল্টো আয়ারল্যান্ড থেকে উচুঁজাতের খাদ্য সম্ভার ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হতো। এসব তথ্যের আলোকে সেন দাবি করেন, দুর্ভিক্ষর কারণ খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং মন্দা অর্থনীতিই দায়ী ছিলো। অর্থনীতিতে মন্দার কারণে ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা মারাতকভাবে হ্রাস পায়। সংকুচিত হয় খাদ্য সরবরাহ। স্বস্থানের খাবার অধিক মূল্যে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। আর স্থানীয় পর্যায়ে দেখা দেয় খাদ্যের অপ্রতুলতা, সৃষ্টি হয় ক্রয়-ক্ষমতার অক্ষমতা। আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

তৃতীয়ত. সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব (deficiency of social justice): সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাবকেও দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যে সমাজে সামাজিক ন্যায়বিচার নেই, সেখানে খাদ্য মজুদ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যমূল্য ও জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে না। সামাজিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান অবিচার দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। আর উচ্চমূল্যের বাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বত্তাধিকার থাকে না বিধায় তারা ক্ষুধার শিকার হয়। এভাবেই সামাজিক অবিচার ক্ষুধা ও দারিদ্রের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পারিভাষিক ও সংজ্ঞাগত দিক থেকেও বলা হয় খাদ্যের অভাবই দুর্ভিক্ষ। পারিভাষিক দিক থেকে তা সঠিক হলেও তত্ত্ব ও বস্তুনিষ্ঠ উপাদান ভিন্ন কথা বলে। এপ্রসঙ্গে আমরা ১৯৪৩ ও ১৯৭৪ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ, ১৯৭২ সালের ইথোপিয়ার উলু ও হারেরঘে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। এসব দুর্ভিক্ষের ঘটনার বর্ণনায় অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই বলেন, খাদ্যের অভাব দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ নয়। ৪১ ও ৪৩ এর বাংলার খাদ্য যোগানের তথ্যের সাহায্যে অর্থনীতিবিদগণ দেখান, ১৯৪১ সালে বাংলায় খাদ্য যোগান যা ছিল ১৯৪৩ সালে সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৯ শতাংশ। অথচ ১৯৪১ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়নি। দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৯৪৩ সালে। সেসময় লক্ষ করা গিয়েছে ভূমিহীন কৃষক ও মৎস্যচাষীদের মতো নিম্ন আয়ের লোকজন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল।

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, যুদ্ধকালীন সমৃদ্ধি-স্ফীতি, অন্যদিকে বণ্টনে বৃটিশদের অসম নীতির কারণে নিম্ন আয়ের মানুষজন আক্রান্ত হয়। সমৃদ্ধি-স্ফীতির সঙ্গে

যুক্ত হয়েছিল খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি। আবার যুদ্ধের কারণে খেটে খাওয়া মানুষজন কর্মক্ষত্রে যেতে নিরাপত্তা পায়নি। খেটে খাওয়া মানুষের কাজের সঙ্গে সুযোগেরও সমন্বয় ছিল না। অন্যদিকে নাগরিক সম্প্রদায়ের জন্য তখন রেশনের ব্যবস্থা করা হলেও গ্রামের মানুষজন সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। একই ঘটনা আমরা লক্ষ করি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত খাদ্য যোগানের হিসেব থেকে দেখা যায় । ১৯৭৪ সালে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। অথচ দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৯৭৪ সালে। এসময়ের দুর্ভিক্ষে মূল কারণই হলো অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্য সংগ্রহের সুযোগে অনুপ্রবেশের বাধা। এই বাধার পেছনের কারণ হলো কর্মঘাটতি ও অর্থনৈতিক মন্দা। কর্মঘাটতি ও অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির কারণ ছিলো সামাজিক বাস্তবতা, মজুদদারি ও ন্যায়বিচারের অভাব। এসব কারণে এসময় পর্যাপ্ত খাদ্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ হয়। বাড়তে থাকে গ্রামীণ জীবনে দারিদ্রের আনুপাতিক সংখ্যা ।

চতুর্থত. দুর্নীতি (Corruption): সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব যেমন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ, তেমনি দুর্নীতিও একটি সামাজিক অবিচার। সামাজিক অবিচার অর্থনৈতিক বণ্টনে প্রভাব ফেলে, প্রকারান্তরে তা দুর্ভিক্ষকে অনিবার্য করে তোলে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দুর্নীতিতে শীর্ষ তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসমূহ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির কারণে সেখানকার জনগণ রাষ্ট্রীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বঞ্চনাসমূহ তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজকর্মে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষপ্রাপ্ত বিদেশী সাহায্য দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় না। রাজনৈতিক দুর্নীতির কারণেও দারিদ্র্য বিমোচনসহ অন্যান্য লক্ষ্য বরাদ্দ বিদেশী অর্থনৈতিক সহযোগিতাসমূহের অপব্যবহার হয়। তন্মধ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত প্রকল্প, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও দায়বদ্ধতার অভাবের কারণে বিদেশী সাহায্যের অপচয় হয়ে থাকে। এইসব ফাঁক ফোকড়ের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কোনো কাজেই আসে না।

নানা পরিপ্রেক্ষিত থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে দুর্নীতিকে দায়ী করা যায়। সমাজে অর্থনৈতিক বণ্টন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় যদি সুনীতি না থাকে, স্বজনপ্রীতি ও গোষ্ঠীপ্রীতি সক্রিয় থাকে, সেখানে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচারের পরিবর্তে দুর্নীতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। দুর্নীতিকে অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। সংক্রামক ব্যাধি যেমন একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমিত হয়, দুর্নীতিও সেরকম। একটি ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্থ হলে অন্য কাঠামো ও ব্যবস্থাসমূহও আক্রান্ত হয়। এভাবে দুর্নীতি একটি রাষ্ট্রের গোটা প্রক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

---

৬ Sen, Amartya, 1999. chap. Seven : "Famine and other Crisis".

৭ "ভারতীয়দের খরগোশের মতো জনসংখ্যা বৃদ্ধি"

পঞ্চমত, আয়-বঞ্চনা (income deprivation): সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রয়েছে। নিম্ন-আয়ের মধ্যে রয়েছে দিন-মজুর, রিক্‌শাচালক, পাট-শ্রমিক, পোষাক শ্রমিক ও জেলে সম্প্রদায়। অন্যদিকে রয়েছে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, ও অতি-উচ্চবিত্ত। বাংলাদেশ এর সাপেক্ষে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন বিত্ত ও পেশার মানুষের মধ্যে মাসিক আয়ে ব্যাপক তারতম্য। এই তারতম্য এতোটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে, নিম্ন আয়ের মানুষজনদের দিনাতিপাত করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির বিলাস, অপচয় আরো ধনী হয়ে ওঠার বাস্তবতাও রয়েছে। আয়-বৈষম্যের এই ধরনের কারণে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠে, অর্থনৈতিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না বঞ্চিত এইসব মানুষজন। এই বঞ্চনার মধ্য দিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আরো তীব্র আকার ধারণ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক কারণ রয়েছে। এসব কারণের একদিকে যেমন রয়েছে অর্থনৈতিক বাস্তবতা, অন্যদিকে সামাজিক, মনসতাত্ত্বিক ও রুচিগত মাত্রাও বাদ দেয়া যায় না। অতিরিক্ত জনসংখ্যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য একধরনের বাস্তবতা, আবার সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব, দুর্নীতি ও আয়-বঞ্চনা অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। কোনোটিই বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ও দারিদ্র্যের কারণ নয়। ক্ষুধা ও দারিদ্রোর পেছনে উভয়ই সক্রিয়, সমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল।

তিন

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন : কয়েকটি দার্শনিক মডেল

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রাকৃতিক কিংবা ভাগ্যজনিত ঘটনা নয়। এটি সমাজ থেকেই সৃষ্ট। ভোগবাদী অর্থনৈতিক নীতি, সামাজিক অবিচার, দুর্নীতি ও অর্থের অসম বন্টনের কারণে উদ্ভূত হয়ে থাকে ক্ষুধাও দারিদ্র্য। প্রশ্ন হলো তাহলে এই সংকট কীভাবে নিরসন করা যায়। ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি দার্শনিকগণ পরামর্শ করেছেন। এসব পরামর্শ অধিকাংশই নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত। দারিদ্র্য বিমোচনের মতো মহৎ উদ্যোগকে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক নীতিদার্শনিকগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো যেতে পারে:

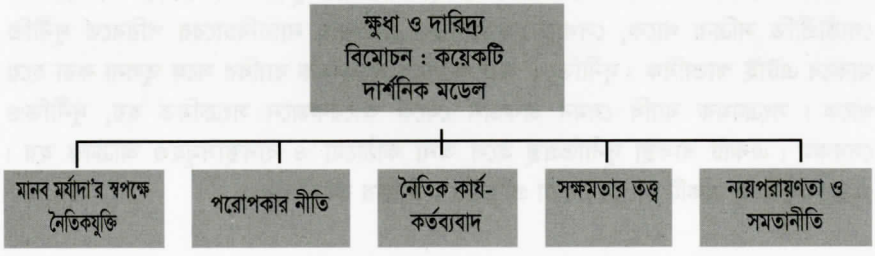

ডায়াগ্রাম ২: ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে নীতিদার্শনিক মডেলসমূহ

ক. মানব মর্যাদার স্বপক্ষে নৈতিকযুক্তি (moral argument for human dignity), খ. পরহিতসাধনের নীতি (principle of benevolence), গ. নৈতিক কার্যবাদ (moral functionism), ঘ. সক্ষমতার তত্ত্ব (capability theory), ঙ. ন্যায়পরায়ণতা ও সমতানীতি (theory of justice nad equality), চ. সাহায্য প্রদান নীতি (principle of aid)। উপর্যুক্ত নীতিগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো :

ক. মানব মর্যাদার স্বপক্ষে নৈতিকযুক্তি: মানুষের মর্যাদাকে কোনোভাবেই হেয় করা যাবে না। কিন্তু ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মানব মর্যাদার জন্য অপমানকর। ইমানুয়েল কান্ট ও অন্যোরাও নীল মানব মর্যাদাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তাদের এই বিবেচনা থেকে অনেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে মানব মর্যাদার পরিপন্থি হিসেবে দেখান।

ডায়াগ্রাম ৩ : ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন নৈতিক মডেল-১ (মানব মর্যাদা)

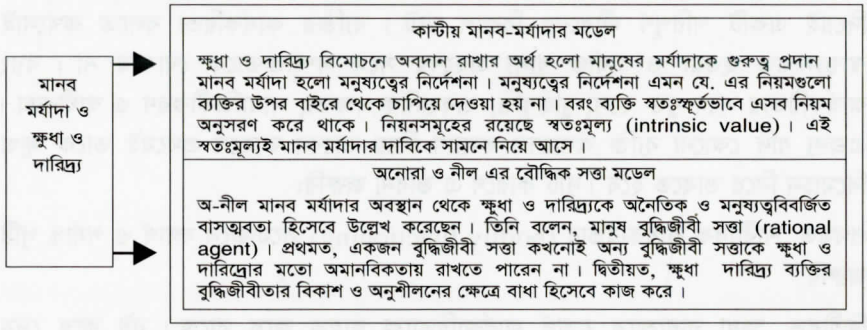

খ. পরহিতসাধনের নীতি: পরহিতসাধনের নীতির প্রচলিত অর্থ হলো গরিব, দুস্থ ও আর্ত মানুষের মঙ্গল ও লাভকে প্রাধান্য দেওয়া। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগ-শোক উপশমের জন্য সামর্থ্যবান মানুষদের যা যা করণীয় সেসবকে গুরত্ব দিবেন দুস্থ ও আর্ত পীড়িত মানুষের জন্য। দরিদ্র মানুষের সু-স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক ঔষধ, টিকা কিংবা যথোপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কার করাও এই লাভজনক নীতির মধ্যে পড়ে। এ নীতিটি স্বতসিদ্ধ একটি নৈতিক নিয়ম। যে কারোর জন্য অক্ষতিকর নীতি হলো একটি স্থির-কর্তব্য (constant duty)। এ কর্তব্য দ্বারা বোঝায় যে কোনো অবস্থায় অন্য কারো ক্ষতি করা যাবে না। আবার, লাভজনক নীতিটি সীমিত কর্তব্য (limited duty)। যেমন, একজন চিকিৎসক যে কোনো অবস্থায় রুগীর সর্বোচ্চ মঙ্গল প্রত্যাশা করবেন। সুতরাং পরহিতসাধনের নীতির দুটি দিক রয়েছে: একটি হলো কারো ক্ষতি না করা, অন্যটি অপরের মঙ্গল বা উপকার করাকে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করা।

---

8 Holtman, Sarah Williams, 2004, "Kantian Justice and Poverty Relief". Kant-Studien, no.95, 86-106.

'Neill, Onora, 1980. "The Moral Perplexities of Famine Relief", in Matters of Life and Death, ed. by Tom Regan, Philadelphia: Temple University Press.

ডায়াগ্রাম ৪ : ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচন নৈতিক মডেল-২ (পরহিতসাধনের নীতি)

পরহিতসাধনের নীতি	
ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার নীতি	১. কারোর ক্ষতি বা মন্দ করা উচিত নয় (যা নৈতিকভাবে যথোচিত নয়)।
পরহিতসাধনের নীতি	২. প্রত্যেকেরই উচিত ক্ষতি বা মন্দকে প্রতিরোধ করা। ৩. প্রত্যেকের উচিত ক্ষতি বা মন্দকে অপসারণ করা। ৪. প্রত্যেকেরই উচিত ভালো কাজ করা। অথবা ভালো কাজকে উৎসাহিত করা উচিত।

গ. নৈতিক কার্যবাদ: অমর্ত্য কুমার সেন, মার্থা নুসবাম এবং ডেভিড ক্রকার প্রমুখের মাধ্যমে এরিস্টটলীয় ধারার বিকাশ ঘটে। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তির কার্যকরিতার মধ্য দিয়েই একটি পরিপূর্ণ জীবনের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তির কার্যকরিতা বলতে কখনোই স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া ও পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে বোঝায় না। বরং কার্যকরিতার সঙ্গে যুক্ত হলো বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যবহারিক দক্ষতা, সামাজিকীকরণ ও স্বাধীনতা। এজন্য যদি কোনো ব্যক্তি অন্যদের কল্যাণ নিয়ে ভাবেন তাহলে প্রথমেই তাকে ক্ষুধা বিমোচন নিয়ে ভাবতে হবে। দুটি কারণে এ ভাবনা জরুরি:

প্রথমত, শারীরিক কার্যকরিতার (bodily functioning) প্রয়োজনে যথার্থ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি জরুরি,

দ্বিতীয়ত, ক্ষুধা নানাভাবে যথার্থ কার্যকারিতাকে ব্যহত করে থাকে। নষ্ট করে দেয় মানুষের সক্ষমতাকে। এরিষ্টটলীয় কার্যকারিমূলকের ইতিবাচক দিক হলো এটি মানব-কল্যাণের একটি পরিপূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম। এ তত্ত্বের আরেকটি দিক হলো উপযোগবাদী এবং কান্টীয় ধারার সীমাবদ্ধতাসমূহ সনাক্ত করতে সক্ষম।

ঘ. স্বত্বাধিকার তত্ত্ব: স্বত্বাধিকার বলতে সেন বুঝিয়েছেন, প্রত্যেকটি সমাজে ব্যক্তির কিছু অধিকার ও সুযোগ থাকে। এসব সুযোগ ও অধিকার কাজে লাগিয়ে সে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। যেমন, কোনো একজন ব্যক্তির ইচ্ছা হলো বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী থেকে একটি পছন্দের পণ্য ক্রয় করে তা উপভোগ করার। এই যে ক্রয় করার সক্ষমতা সে অর্জন করেছে, ইচ্ছামাফিক কোনো পণ্য কিনতে পারছে এটাই হলো স্বত্বাধিকার। অমর্ত্য সেন আরো একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে স্বত্বাধিকারকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি উপার্জন করতে পারছে ২০০ ডলার। এখন তার প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো পণ্যগুচ্ছ সেগুলো যদি

9 Dreze, Jean and Sen, Amartya, 1989. Hunger and Public Action (HPA), Oxford: Clarendon Press.

10 Croker, David A. 1997. 'Hunger, Capaility and Development', In Ethics in Practice, ed by Hugh La Follette, London: Blackell Pub., p. 607.

ডায়াগ্রাম ৪ : ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচন নৈতিক মডেল-২ (পরহিতসাধনের নীতি)

পরহিতসাধনের নীতি	
ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার নীতি	১. কারোর ক্ষতি বা মন্দ করা উচিত নয় (যা নৈতিকভাবে যথোচিত নয়)।
পরহিতসাধনের নীতি	২. প্রত্যেকেরই উচিত ক্ষতি বা মন্দকে প্রতিরোধ করা। ৩. প্রত্যেকের উচিত ক্ষতি বা মন্দকে অপসারণ করা। ৪. প্রত্যেকেরই উচিত ভালো কাজ করা। অথবা ভালো কাজকে উৎসাহিত করা উচিত।

গ. নৈতিক কার্যবাদ: অমর্ত্য কুমার সেন, মার্থা নুসবাম এবং ডেভিড ক্রুকার প্রমুখের মাধ্যমে এরিস্টটলীয় ধারার বিকাশ ঘটে। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তির কার্যকরিতার মধ্য দিয়েই একটি পরিপূর্ণ জীবনের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তির কার্যকরিতা বলতে কখনোই স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া ও পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে বোঝায় না। বরং কার্যকরিতার সঙ্গে যুক্ত হলো বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যবহারিক দক্ষতা, সামাজিকীকরণ ও স্বাধীনতা। এজন্য যদি কোনো ব্যক্তি অন্যদের কল্যাণ নিয়ে ভাবেন তাহলে প্রথমেই তাকে ক্ষুধা বিমোচন নিয়ে ভাবতে হবে। দুটি কারণে এ ভাবনা জরুরি:

প্রথমত, শারীরিক কার্যকরিতার (bodily functioning) প্রয়োজনে যথার্থ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি জরুরি,

দ্বিতীয়ত, ক্ষুধা নানাভাবে যথার্থ কার্যকারিতাকে ব্যহত করে থাকে। নষ্ট করে দেয় মানুষের সক্ষমতাকে। এরিষ্টটলীয় কার্যকারিমূলকের ইতিবাচক দিক হলো এটি মানব-কল্যাণের একটি পরিপূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম। এ তত্ত্বের আরেকটি দিক হলো উপযোগবাদী এবং কান্টীয় ধারার সীমাবদ্ধতাসমূহ সনাক্ত করতে সক্ষম।

ঘ. স্বত্বাধিকার তত্ত্ব: স্বত্বাধিকার বলতে সেন বুঝিয়েছেন, প্রত্যেকটি সমাজে ব্যক্তির কিছু অধিকার ও সুযোগ থাকে। এসব সুযোগ ও অধিকার কাজে লাগিয়ে সে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। যেমন, কোনো একজন ব্যক্তির ইচ্ছা হলো বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী থেকে একটি পছন্দের পণ্য ক্রয় করে তা উপভোগ করার। এই যে ক্রয় করার সক্ষমতা সে অর্জন করেছে, ইচ্ছামাফিক কোনো পণ্য কিনতে পারছে এটাই হলো স্বত্বাধিকার। অমর্ত্য সেন আরো একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে স্বত্বাধিকারকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি উপার্জন করতে পারছে ২০০ ডলার। এখন তার প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো পণ্যগুচ্ছ সেগুলো যদি

9 Dreze, Jean and Sen, Amartya, 1989. Hunger and Public Action (HPA), Oxford: Clarendon Press.

10 Croker, David A. 1997. 'Hunger, Capaility and Development', In Ethics in Practice, ed by Hugh La Follette, London: Blackell Pub., p. 607.

২০০ ডলারের মধ্যে হয় এবং সে যদি তা অনায়াসে কিনতে পারে এই সামর্থ্যই হলো স্বত্বাধিকার। অর্থাৎ ২০০ ডলার কিংবা তার চেয়ে কম দামী পণ্যসামগ্রী তার স্বত্বাধিকারের মধ্যে পড়ে। তাহলে স্বত্বাধিকার নির্ভর করে কয়েকটি শর্তের উপরে :

(১) ব্যক্তির কাজ জোটানোর সামর্থ্যের উপরে,

(২) সেই কাজের পারিশ্রমিকের উপর ও ব্যক্তি যেসব পণ্যসামগ্রী কিনতে চায় তার মূল্যের উপরে।

সুতরাং সবমিলিয়ে এখানে দুটি স্বত্ব রয়েছে, একটি হলো সম্পত্তির উপর ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব এবং অন্যটি হলো বিনিময়ের সুযোগ। এই স্বত্বের উপলব্ধি ব্যক্তিকে কয়েকটি সামর্থ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পুষ্টি অর্জনের সামর্থ্য ও খাদ্যের সামর্থ্য তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, ব্যক্তি হয়তো স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সেবা, শিক্ষাসহ অন্যান্য সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং সক্ষমতা অর্জনের শর্তটি স্বত্বাধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি না করার ফলেই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। এপ্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের উদাহরণ আনেন। এখানে তিনি দেখান, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে স্বত্বাধিকার সমস্যা ঘটেছিল। সেন বিভিন্ন তথ্যসূত্রের আলোকে দেখান, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ও মজুদ দুর্ভিক্ষ হবার মতো ছিল না। সেন এর তথ্যসূত্র অনুসারে ৭১-৭৪ সময়ে মাথাপিছু খাদ্যের জোগান সবচেয়ে বেশি ছিল ১৯৭৪ সালে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৯৭৪ সালে। এসময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কৃষকের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে যথাসময়ে তারা ফসল বপন করতে পারেনি। ফলে দিনমজুর কাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এই বঞ্চনার ফলে সে অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মজুদদার ও ফটকাব্যবাসায়ীরা খাদ্য বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি করে দেয়। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে তারা পণ্যের উপর স্বত্বাধিকার হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টি হয় দুর্ভিক্ষ। এজন্য সেন বলেন, একমাত্র সক্ষমতা সৃষ্টি এবং স্বত্বাধিকারই পারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখতে।

উপর্যুক্ত দুটি মডেলকে এভাবে দেখাতে পারি :

ডায়াগ্রাম ৫ : ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন নৈতিক মডেল-৪ (কার্যবাদ)

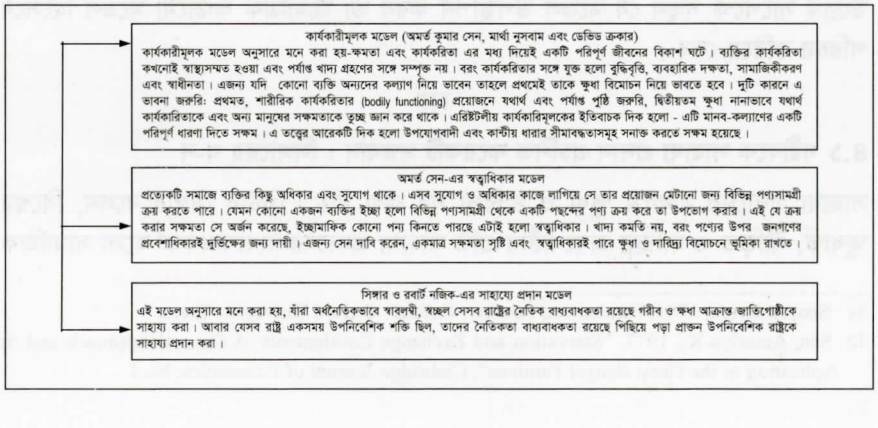

ঙ. ন্যায়পরতার নীতি: এরিস্টটলের "giving to each that which is his due" নীতির উপর ভিত্তি করে ন্যায়পরতার নীতির দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিটি দ্বারা বোঝায় সমাজে যে কোনো দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রীর বণ্টনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বণ্টন নীতি প্রয়োজন। পাশাপাশি ভোক্তার যথার্থ স্বত্বাধিকার (fair entitlement) রয়েছে কি-না তাও বিবেচনার বিষয়। আবার অনেকসময় হয়তো দেখা যেতে পারে কোনো একটি পণ্যসামগ্রীর স্বল্প যোগান থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে হয়তো বন্টনের সমতা বা যথোপযুক্ততার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এরকম বাস্তবতায় যথোপযুক্ততা বা ন্যায় হলো সীমিত সম্পদের যোগান বাড়ানো ও বরাদ্দ দেওয়া। ন্যায়পরতার নীতিটি মূলত কতোগুলো আদর্শ অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। সেগুলো হলো :

১. প্রত্যেক ব্যক্তির সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা,

২. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য প্রদান করা,

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান,

৪. প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই মাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে যে-মাত্রায় সে অবদান রাখে।

সামাজিক জীবনে, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি ন্যায়পরতা থাকে তাহলে সেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকতে পারে না।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন নৈতিক মডেলকে আমরা উপর্যুক্ত ডায়াগ্রামে (মডেল-১, মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪) দেখাতে পারি। চারটি মডেলের মধ্যে প্রথম মডেলটি কান্ট, ও ওনীল-এর নৈতিক নীতিসমূহের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ মডেলটি নীতিদর্শনের সঙ্গে অর্থনীতির সমন্বয় করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল দেখানো হয়েছে। সবকয়টি মডেলই ব্যক্তির মর্যাদা, স্বাধীনতা, স্বত্বাধিকার, এবং বৌদ্ধিক সত্তার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা পিটার সিঙ্গারের The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty আলোকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনের মডেল উপস্থাপন করার প্রয়াস নেব। পাশাপাশি উক্ত মডেলের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ সাপেক্ষে নতুন যে মডেল উপস্থাপন করব তা ত্রিমাত্রিক কাঠামো মডেল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেব।

চার

৪.১ গরীবকে সাহায্য প্রদান প্রচলিত কয়েকটি মতবাদ : সিঙ্গারের খ-ন

সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করা যায়। পিটার সিঙ্গার বলেন, বিশ্বের ক্ষুধার্ত, পীড়িত ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতি সাহায্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা হলো সামাজিক

11 Sen, Amartya, 1981, Famine and Poverty, Oxford : Oxford University Press.

12 Sen, Amartya K., 1977. "Starvation and Exchange Entitlements: A General Approach and its Aplication to the Great Bengal Famines", Cmbridge Journal of Economics, No.1.

সহানুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করারই নামান্তর। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে 'সহযোগিতর নীতি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম বিশ্ব ও তৈলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কথা ধরা যাক। তৃতীয় বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত। কিন্তু, ঐসব দেশের নাগরিকগণ যদি তাদের নিজস্ব মানবীয় চাহিদাসমূহ মিটিয়ে সম্পদের যে উদ্বৃত্ত অংশ থাকে তা থেকে কিছু অংশ ক্ষুধাও দারিদ্র্য আক্রান্ত মানুষের জন্য সাহায্য করে, তাহলে দারিদ্র লঘুকরণে অনুন্নত বিশ্ব অনেকদূর অগ্রসর হতে পারবে।

ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি পিটার সিঙ্গার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্যের সাহায্যে সিঙ্গার বলেন, ধনী দেশসমূহ যদি তাদের আয়ের কিঞ্চিৎ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আক্রান্ত মানুষের জন্য সাহায্য করে তাহলে পৃথিবী থেকে ক্ষুধাও দারিদ্র্য অনায়াসে বিমোচন করা যাবে। কিন্তু সাহায্য প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তা করছে না, ফলে দারিদ্র্য দেশের জনগোষ্ঠী রোগ-শোক, অভুক্তি, অপুষ্টি এবং মৃত্যুর ন্যায় পরিণামী যন্ত্রণায় আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যক্তিকে হত্যা করা আর মৃত্যুবরণে বাধ্য করা এ দুয়ের মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কর্তব্যবোধের দিক থেকে উভয়টিই অন্যায়। পিটার সিঙ্গার তাঁর The Life You Can Save গ্রন্থের তৃতীয় এ সম্পর্কিত একটি রূপরেখা দিয়েছেন।

তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেন, সাহায্য করার বহুমুখী উৎস রয়েছে। চ্যারিটি তন্মধ্যে একটি। কিন্তু সাহায্যের উৎস হিসেবে চ্যারিটি কতোটা কার্যকর। এপ্রশ্নের একটা যুৎসই উত্তর লক্ষ করা যায় পিটার সিঙ্গারের The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty গ্রন্থের "Common Objection to Giving" অধ্যায়ে। অনেক তাত্ত্বিকই চ্যারিটি সংগঠনকে অনুদান দেবার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এরকম আপত্তির বিরুদ্ধে সিঙ্গারের অবস্থান হলো :

"ধরা যাক আমেরিকার অপেক্ষাকৃত ধনী শহরতলী বোস্টনের কোনো একটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয় পছন্দ করতে বলা হলো। বিষয়সমূহ হলো: সাহিত্য, ন্যায়তত্ত্ব ও স্লেনভিউ হাই (এটি একটি ছদ্মনাম)। তারই অংশ হিসেবে তাদের শিক্ষাকে পিটার সিঙ্গারের ১৯৯৯ সালে The New York Times এ প্রকাশিত দারিদ্র্য বিষয়ক প্রবন্ধটিও কোর্সের অংশ হিসেবে পড়তে দেওয়া হলো। এরকম অবস্থায় তাদেরকে অনুরোধ করা হলো এ প্রবন্ধটির প্রতিক্রিয়া লেখার জন্য। লক্ষ করা গিয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা যে প্রতিক্রিয়া করেছিল তা একেবারেই আমেরিকান সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্য থেকে"।

সিঙ্গারের এই বর্ণনার ধরনটি প্রচার কম ভাবে নৈতিক অপেক্ষা কর্তাবাদী দৃষ্টিকোণ দ্বারা আচ্ছন্ন। শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া থেকেই বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক, 'ক' কোর্সের শিক্ষার্থী ক্যাথরিন লিখেছেন, "পৃথিবীতে কৃষাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ বলে কোনো

সর্বজনীন কোড নেই। আর এটা খুবই ভালো হয় যদি পৃথিবীর সবাইকে তার নিজস্ব বিশ্বাস কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে চলতে দেওয়া হয়।" পিটার সিঙ্গার এরকম পরিপ্রক্ষিতের জবাবে বলেন, আমাদের অনেক বিশ্বাস আছে যেগুলো বেঠিক, আমাদের উচিত ঐসব বেঠিক বিশ্বাস অনুসরণে কাজ বন্ধ করে দেওয়া। তিনি বলছেন, " যেসব লোকজন অমানব-প্রাণীর প্রতি হিংস্র আচরণ করে তা আমাদের বন্ধ করা উচিত। যেভাবে ধর্ষককে ধর্ষণের মতো ন্যাক্কারজনক কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করি। সন্ত্রাসীকে থামিয়ে দিই তাদের সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য।" এরকম উদাহরণের প্রেক্ষাপটে সিঙ্গার বলেন, বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে আমরা যদি নৈতিক আপেক্ষাকৃতবাদকে পরিহার করি তাহলেই কেবল তা পরিহার করা সম্ভব।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য না করা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আপত্তি হলো "প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে তার অর্জিত অর্থসমূহ তার খেয়ালখুশি মতো খরচ করার।" এর জবাবে সিঙ্গার বলেন, প্রথমত, গরীব দেশের মেধাবী লোকেরা নিজেদের উন্নয়নে তেমন কোনোই ভূমিকা রাখতে পারছেন না, কারণ তাদের সফলতা দেখানোর মতো তেমন কোনো সুযোগ সুবিধাই নেই। কিংবা, তারা জানে না কোন ক্ষেত্রে কীভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কারণ তাদের সেরকম পর্যাপ্ত পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধাদি নেই। এপ্রসঙ্গে সিঙ্গার নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট সিমন প্রদত্ত "সামাজিক পুঁজি তত্ত্বের" বিবেচনাটি উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি দেখান, পৃথিবীর গোটা আয়ের ৯০% ভাগই সম্পদশালী সমাজের। কুক্ষিগত অর্থ গুটি কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণে। এ অর্থ যদি সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হয় তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে খুবই সহায়ক হবে। সামাজিক পুঁজি হলো দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা, দায়িত্বশীল পুলিশ ফোর্স, ন্যায়বিচারক কোর্ট, সুনিয়ন্ত্রিত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নির্ভরযোগ্য পাওয়ার সাপস্নাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। অধিকাংশ দারিদ্র্য দেশের এই সুযোগসমূহ নেই। এসব সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভব ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কমিয়ে আনা।

উপর্যুক্ত অধিকারবাদী অবস্থানের সমালোচনায় সিঙ্গার বলেন, কারো অধিকার আছে এর অর্থ নয় তা ঔচিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সিঙ্গার বলতে চাচ্ছেন, আমাদের অর্থের সাহায্যে আমাদের কী পছন্দ করা উচিত তা নির্ধারণ করাই যৌক্তিক। শতকরা উচুঁ হারের কর, কিংবা অন্যকোনো চাপমূলক পন্থায় সাহায্য বাড়ানোর কথা সিঙ্গার বলছেন না। কোনো সরকারেরই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল নিয়ে তিনি সমালোচনা করছেন না। বরং তিনি বিত্তবানদের প্রভাবিত করতে চাচ্ছেন কীভাবে তারা গরীবদের সহযোগিতা করার জন্য ভূমিকা রাখতে পারেন ।

১৩ উদাহরণটি নেয়া হয়েছে,
Singer, Petter, 1981. Practical Ethics, Cambridge : Cambridge University Press, p.162.
14 Ibid, p. 162
15 Singer, 2009, pp. 24-5.
১৬ সিঙ্গারের এসম্পর্কিত আলোচনার জন্য দেখুন : Singer, 2009, p. 25.
17 Singer, 2009, p. 26.

সাহায্য প্রদান করার বিরুদ্ধে আরেকটি আপত্তি হলো, উচু হারের কর প্রদানের মাধ্যমে আমেরিকানরা প্রচুর অবদান রাখছে তাদের সামাজিক উন্নয়নে। বিত্তবানগণ তাদের উপার্জিত অর্থ থেকে অধিক হারে রাষ্ট্রকে কর দিচ্ছেন। সুতরাং সেই করের সুবিধাদি তারাই ভোগ করবে। প্রশ্ন হলো গরীব মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমেরিকানরা কেন এতো উঁচু হারের কর দিবে। সিঙ্গার এধরনের আপত্তির জবাবে বলেন, অধিকাংশ জনগণ কি ভাবছে তা কতোটা তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা জানা দরকার। কারণ, আমেরিকান সরকারী ব্যায়ের মাত্র ১% এর চেয়ে কম পরিমাণ অর্থ বিদেশী সাহায্যে অনুদান করছে। চারটি জরীপেই দেখা যায় আমেরিকান নাগরিকগণ জানতে চেয়েছে কী পরিমাণ অর্থ বিদেশী সাহায্য হিসেবে যাচ্ছে। আমেরিকান নাগরিকদের উপর পরিচালিত এ গবেষণা থেকে জানা যায় অধিকাংশ আমেরিকান জনগণই বলেন, আমেরিকান জনগণ বেশিমাত্রায় বিদেশী সাহায্য দিচ্ছে, কিন্তু যখনই জিজ্ঞাসা করা হয় আমেরিকানদের কী পরিমাণ সাহায্য দেওয়া উচিত। তাদের অনেকেই বলেন, সরকারী আয়ের ৫% থেকে ১০% সাহায্য দেওয়া উচিত। কিন্তু, অনেকেই সাহায্যের যে পরিমাণের কথা বলেন তা আমেরিকার প্রকৃত সাহায্য প্রদানের চেয়ে পাঁচ থেকে দশগুণ বাড়িয়ে বলা হয়। এমনকী প্রতি ৳১০০ আয়ের মধ্যে ২৫ সেন্টও তারা বিদেশী সাহায্যের জন্য বরাদ্দ রাখছেন না। আবার অনেকে চিন্তা করেন, জনগণকে অর্থ সাহায্য দেওয়া উচিত কেবল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য। এরকম অভিযোগের জবাবে সিঙ্গার বলেন, আবশ্যই জরুরি কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে আমাদের সরাসরি অর্থ বা খাদ্য সাহায্য দেওয়া উচিত নয়। এতে করে পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যাবে।

অনেক উন্নত বিশ্বেই দেখা যায় স্থানীয় বাজারে খাদ্য ধ্বংস করা হয়, এবং বিক্রি করার জন্য কৃষকরা যেন কম খাদ্য উৎপাদন করে সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। আমাদের উচিত তাদের প্রয়োজনসমূহ ধারণযোগ্য নীতির আলোকে মেটানো। আর সেটি তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায়ই হওয়া উচিত। এজন্য সিঙ্গার মনে করেন, সাহায্য প্রদানের জন্য সঠিক পন্থা বের করা মামুলি বিষয় নয়, কিন্তু এটি সম্পন্ন করা জরুরি।

তিনি আরো যে যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করেন তা অনেকটা ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসরণে। এ যুক্তিতে তিনি উল্লেখ করেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে করে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের সংকুলান হয়ে উঠবে না। দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত মানুষদের সাহায্য প্রদান দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য ভয়ানক পরিণাম ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে সিঙ্গার তিনটি পাল্টা যুক্তি দাঁড় করান :

প্রথমত, পৃথিবীর প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য আমরা উৎপাদন করি, যদি আমরা সেসব শস্য অমানব-প্রাণিকে না খাইয়ে সরাসরি মানুষের মধ্যে সরবরাহ করতে সাহায্য করি গ্রহণ করি তাহলে তা মানুষের ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ কমিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত, লোকজন বেশি করে সন্তান নেয় একারণে যে বৃদ্ধাস্থায় তারা তাকে দেখাশোনা

করবে। কিন্তু, কোনো রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন জনসংখ্যা কমানো, কম সন্তান গ্রহণ করা। কারণ খুব ক্ষেত্রেই রয়েছে যেখানে সন্তানরা তার পিতামাতার দায়িত্ব নেয়।

তৃতীয়ত, কোনোপ্রকার চাপমূলক পরিমাপ না করেও আমরা জনসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বেধে রাখতে পারি। লক্ষ করা যাক, গরীব রাষ্ট্রসমূহে যেসব মেয়েদের কেনো শিক্ষা-দীক্ষা নেই তাদের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের সন্তান-সন্ততি কম। উদাহরণটি আমাদের ইঙ্গিত করছে নারী-শিক্ষাই পারে অধিক জনসংখ্যা রোধ করতে। অনেক ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রকও অধিক জনসংখ্যা রোধে ভূমিকা রাখতে পারে। আরেকটি আপত্তি এসেছে অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ইস্টারলির মাধ্যমে। তিনি The White Man's Burden গ্রন্থে দেখান গরীব রাষ্ট্রসমূহের জন্য পাশ্চাত্য ধনী রাষ্ট্রসমূহের প্রদত্ত সাহায্য অনেকটা অকার্যকরী। গত পঞ্চাশ বছরে পাশ্চাত্য ধনী রাষ্ট্রসমূহ গরীবদের জন্য ব্যয় করেছে ৳২.৩ ট্রিলিয়ন পরিমাণ অর্থ। কিন্তু এখন পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। এমনকী গরীব পরিবারের লোকজন চার ডলার খরচ করতে পারে না মশারী কেনার জন্য। উইলিয়াম ইস্টারলির এরকম সমালোচনার জবাবে সিঙ্গার বলেন, প্রত্যেকটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র যে পরিমাণ সাহায্য দেয় তার অধিকাংশই রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থে প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া সাহায্য করে এই শর্তে যেন গরীব রাষ্ট্রসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে। এই শর্ত অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করলেও সাহায্য হিসেবে ঐ অর্থ গরীব মানুষদের জন্য খুব একটা কাজে লাগে না। সুতরাং, পাশ্চাত্য সাহায্যসমুহ যে শর্তে প্রদান করা হয় তা খুব একটা কার্যকরী হয়ে উঠবার কথা নয়।

শেষতক অনেক তাত্ত্বিকরাই ধনী রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাঁরা বলেন, সাহায্য গরীবদের অবস্থার উন্নতি না করে বরং ক্ষতিই করে থাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সমস্যাটিকে বলা হয় "ডাচ রোগ" (dutch disease)। এই সমস্যাটি হলো যখন কোনো একটি রাষ্ট্রে বাইরের অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন তার সমসাময়িক অর্থ প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এতে করে রপ্তানি মূল্য বেড়ে যায় এবং স্বদেশী প্রস্তুতকারকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। অর্থনীতির এই রোগ কমানোর জন্য বিদেশী সাহায্য পরিহার করাই উত্তম। কোনো রাষ্ট্র যখন বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য তার অবকাঠামোগত উন্নয়নে, কৃষি পদ্ধতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নে, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন সক্ষমতা ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে ব্যয় করে তখনই কেবল "ডাচ অর্থনৈতিক রোগজনিত সমস্যা সমাধানে তা ভূমিকা রাখতে পারে।" সুতরাং সাহায্য প্রদান নিয়ে প্রচলিত এসব মতবাদের বিরুদ্ধে পিটার সিঙ্গারের অবস্থান। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা সিঙ্গারের অবস্থানটি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেব।

পাঁচ

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সিঙ্গার-এর মডেল

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রদের সাহায্য বিরোধী তত্ত্ব সম্পর্কে সিঙ্গারের সমালোচনাটি ইঙ্গিত করে তিনি বিদেশি সাহায্যের পক্ষ। এই লক্ষে তিনি The Life You Can Save গ্রন্থে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছেন :

প্রথমেই তিনি উলেস্নখ করেন, প্রত্যেকের উচিত চরম দারিদ্র্য (extreme poverty) সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। অনেকে যদিও মনে করেন, দারিদ্র্য নির্মুল বা বিমোচন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি আমরা নৈতিক আচরণের পরিবর্তন করতে পারি তবেই কেবল সেটি সম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই যেন নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাস করি আমরা কি করছি এবং আমাদের কি করা উচিত। এ প্রশ্নটির সদুত্তরই পারে আমাদেরকে নৈতিক জীবনের দিকে নিয়ে যেতে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নৈতিক জীবন যাপনের জন্য আমাদের গতানুগতিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তন খুবই জরুরি। এজন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। নৈতিক জীবনের অধিকারী হবার জন্য প্রয়োজন মানসিক পরিবর্তনের অপরিহার্য শর্তসমূহ অনুসরণ করা। এই শর্তকে তিনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা আমরা দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি:

১. প্রথমতই আমাদের মধ্যে মানবিকতা (philanthropy) জাগাতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিঙ্গার স্থানীয় পর্যায়ে কর্মবাদী (local activism) হবার পরামর্শ দেন। প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের উচিত স্থানীয় জনগণ সক্রিয়, উদ্যোমী ও কর্মঠ করে তোলা। এই লক্ষে তাদের মধ্যে প্ররোচনা ও প্রচারণা চালানো খুব জরুরি। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি রাজনৈতিক সচেতনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। জনগণের বোধ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম হবে সেটাই তাদেরকে প্রেরণা দিবে ধনী রাষ্ট্র থেকে আসা সাহায্যসমূহ যথার্থভাবে বণ্টন করতে।

২. এই শর্তটি সহযোগিতা করার মনোভাবের সঙ্গে জড়িত। স্বচ্ছল প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত তার অর্জিত আয় থেকে অতিরিক্ত গরীবদের জন্য খরচ করা। এপ্রসঙ্গে তিনি আমেরিকান জনগণের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ৯৫% আমেরিকান যদি তাদের আয়ের ৫% গরীব মানুষের জন্য অনুদান প্রদান করে তাহলে সেসব দেশে কোনো দারিদ্রতা থাকার কথা নয়।

---

18 Singer, 2009, pp. 35, 36, 37.

19 Singer, 2009, pp. 121, 122, 123, 124.

20 Easterly, William, 2007. The White Man's Burden. London: Penguin. p. 4; quoted in Singer, 2009, pp. 105, 108.

21 Singer, 2009, p. 112.

প্রশ্ন হলো ধনী রাষ্ট্রসমূহ কেন গরীবদের সাহায্য করবে। এ প্রশ্নের জবাব পাই সিঙ্গারের The Life You Can Save গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে। একটি উদাহরণের সাহায্যে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সে রাস্তার পাশের পুকুরে একটি শিশুকে ডুবে যেতে দেখল। অথচ আশে পাশে কেউ নেই যে তাকে বাঁচাবে। কিন্তু, পথচারি যদি শিশুটিকে বাঁচাতে চায় তাহলে তার জুতো ভিজে যাবে, কাপড় কর্দমা লাগতে পারে। এমনকি তিনি যে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন সেখানে তার বিলম্ব ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির কী করা উচিত।

সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা অনুসারে অবশ্যই আমাদেরও উচিত ঐ ডুবে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধার করা। এখানে দুটি মূল্য সমান্তরালভাবে রয়েছে:

১. একটি মূল্য হলো ডুবে যাওয়া শিশুর জীবন।

২. অন্য মূল্যটি হলো পথচারির জুতা ভিজে যাওয়া, কাপড়ে কাদা-মাটি ভরা এবং তার অফিসে দেরিতে পৌঁছানো ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কেউই হয়তো মেনে নিবেন যে ডুবে যাওয়া শিশুটির প্রাণ বাঁচানো বিষয়ে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। যেকোনো মূল্যে এ কাজটি আমাদের করা উচিত। এটির সঙ্গে মানবমূল্যের শর্তটিও জড়িত।

এপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে সিঙ্গারও বলেন, যে কেউ আমরা চরমভাবে নিশ্চিত যে, ডুবন্ত শিশুর জীবন রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। যে কোনো মূল্যে আমাদের এ কাজটি করা উচিত। অনেকে হয়তো বলত পারেন দৈনিক হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। অনেক শিশু রয়েছে যারা পুষ্টিহীনতায় মারা যাচ্ছে, অথচ তাদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারছি না। তাহলে যেসব শিশু আমাদের থেকে দূরবর্তী কোথাও খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য আমরা কী করতে পারছি। কিংবা তাদেরকে সাহায্য করা কী বেঠিক। যদি তাই হয়, তাহলে গরীব লোকদের কতোটুকু সাহায্য করা উচিত। এরকম দুটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াসই হলো পিটার সিঙ্গার-এর The Life You Can Save এর মূল লক্ষ।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যান্য উপায় বা কৌশলের পাশাপাশি আমাদের মনস্তত্ত্বও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যেমন, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যদি কোনো সম্মেলনে কঠিন বা দুর্গম কোনো স্থানে যেতে হয় আমরা সেরকম স্থানে যেতেও প্রস্তুত। দারিদ্র্য বিমোচনের মতো যুগান্তর-সৃষ্টিকারী ঘটনার জন্য আমাদের যার যতোটুকু সামর্থ্য রয়েছে সেটুকু সাধ্যমত প্রদান করার মানসিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। সম্প্রতি পৃথিবীর ধনীরাষ্ট্রের কিয়দংশ জনগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই ইস্যু নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই লক্ষে ওয়ারেন বাফেট ৩১ বিলিয়ন ডলার এবং বিল গেট্স ও মেলিন্ডা গেট্স ২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পিটার সিঙ্গারও জোরালোভাবে দাবি করেন, উন্নত বিশ্বের কিয়দংশ যদি তাদের জীবনের

চাকচিক্য কিছুটা বর্জন করে গরীবদের জন্য সঞ্চিত রাখে তাহলে অনায়াসে পৃথিবীর বিশাল গরীব জনগোষ্ঠীর জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসতে সক্ষম। অধিকসংখ্যক লোক যদি এ ক্ষেত্রে কোনো অবদান না রাখে তাহলে আমাদের পক্ষে সম্ভব না এই লক্ষে উপনীত হওয়া। এরকম বাস্তবতায় আমরা প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাস করতে পারি : "গরীবদের সাহায্য করার জন্য আমাদের কী করা উচিত।" এপ্রসঙ্গে সিঙ্গার দুটি লক্ষ নির্ধারণের কথা বলেন :

এক. যারা চরম দারিদ্র্যসীমায় বাস করে তাদের জন্য কিছু করার বাধ্যবাধকতা একটি সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

দুই. নিজের আয় বা উপার্জন থেকে কিছু অংশ দারিদ্র্যদের সাহায্যে রেখে দেবার মতো মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সিঙ্গারের মডেলটির গুরুত্ব হলো নৈতিকভাবে ধনী মানুষদের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করা। পাশাপাশি মানুষদেরকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য একটি অমর্যাদাকর ও অমানবীয় বাস্তবতা। এই বাস্তবতা বোঝানোর জন্য তিনি গরীবদের কিছু সাধারণ অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন।

৫.২ গরীবজনদের সাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা

কেন গরীব মানুষদের সাহায্য করা উচিত। সিঙ্গার এ প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষে দারিদ্রোর একটি সংজ্ঞা অনুসন্ধান করেছেন। এপ্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার বিশ্ব ব্যাংকের সূত্র ধরে দারিদ্র্যের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বহন করে :

১. সারা বছরই যদি খাদ্যের ঘাটতি থাকে, তাহলে ব্যক্তি দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়। সন্তানের ক্ষুধা ও নিজের ক্ষুধা এ দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটিকে সে জিইয়ে রাখবে এ নিয়ে তাকে উভয় সংকটে পড়তে হয়।

২. গরীব হবার কারণে তাদের কোনো অর্থনৈতিক মজুদ থাকে না। যদি তাদের পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ে, জটিল কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তাদেরকে ধার-দেনা করে জীবন নির্বাহ করতে হয়। অথবা কোনো সংস্থা থেকে ঋণ নিতে হয়। যদি কোনো কারণে পরবর্তী সময়ে ভালো মতো ফসল না ফলে, কিংবা কোনো কাজ না পায় তাহলে তারা এই ঋণ আর পরিশোধ করতে পারে না। এতে করে তাদের অর্থসংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করে।

---

22 Singer, 2009. p.3.
23 Singer, 2009. p. xiii-iv.
24 Singer, 2009. pp. 5-6.
25 Singer, 2009. (p. 8).
26 Singer, 2009. p. 6)
27 Singer, 2009. ,p. xv

৩. অর্থনৈতিকভাবে গরীবজনরা সংকটাপন্ন হবার কারণে তাদের সন্তানদের শিক্ষা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না।

৪. বসবাস করতে হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ভঙ্গুর ঘরে, যা প্রায়শই মেরামতের প্রয়োজন হয়। এই মেরামতের জন্যও তার স্বল্প আয় থেকে প্রতিবছর অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

৫. এমনকী গরীবজনদের বিশুদ্ধ পানি পানেরও কোনো ব্যবস্থা নেই।

গরীবজনদের দুরবস্থা সম্পর্কে তিনি আমাদের জানান, তারা সকল সময়ই অপুষ্টিতে ভোগে। তাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত খাদ্যের পুষ্টিগুণ নেই। গরীবদের এ অবস্থা বর্ণনায় তিনি বলছেন,

"শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফল এমন যে অনেকসময় তাদের মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি হয় যা অনেক ক্ষেত্রে সেরে উঠে না। শারীরিক বৃদ্ধি শ্লথ হওয়াসহ তারা দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, ফলত তারা ন্যুনতম যেটুকু শারীরিক শক্তি থাকার কথা সেটুকুও হারিয়ে ফেলে। এমনকী তারা কায়িক কোনো পরিশ্রম ও কসরতও করতে পারে না।"

এরকম বাস্তবতায় মানুষ হিসেবে তাদের যে মর্যাদাবোধ থাকার কথা সেটুকুও হারিয়ে ফেলে। মাত্রাগত দিক থেকে দারিদ্র্যের নিকৃষ্ট ধরনটি হলো চরম দারিদ্র্য (extreme poverty)। ক্ষমতাহীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোনো নিরাপত্তা না পাবার কারণে গরীবদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে আরো চরম অধোগতি হয়। গরীব মানুষজন আরো গরীব হতে থাকে। এমনকী যেসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত সুশাসন রয়েছে সেসব রাষ্ট্রেও অনেক গরীব জনগণ জীবনের চরম অবহেলাকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেয়। বিশ্বব্যাংকের এক জরীপে অধিকাংশ উত্তরদানকারী এরকমই জানিয়েছেন। আবার এরকমও দেখা গিয়েছে কোনো সরকারী অনুদান বণ্টনের সময় তারা কম পেলে পুলিশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে অভিযোগ করলে তারা মোটেই পাত্তা দেয় না। অনেক গরীব জনগণ যদি ধর্ষিত হয়, কিংবা যৌন-নিপীড়নের শিকার হয়, সেক্ষেত্রে আইনও তাদেরকে প্রতিকার করে না। প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও হীনম্মন্যতা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সন্তানদের তারা পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। তাদের জীবনেও কোনো স্বাচ্ছন্দ নেই। আয়েস করার সুযোগ নেই। এমনকী প্রয়োজন অনুসারে বেঁচে থাকার ন্যুনতম কোনো অবলম্বনও তারা পায় না। এসব কারণে তারা যেমন শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে থাকে, তেমনি মানসিকভাবেও তাঁরা লজ্জা ও ব্যর্থতায় ন্যুব্জ থাকে। বস্তুত হীনদরিদ্র অবস্থা প্রতিনিয়ত গরীবজনদের তাড়িত করে। সর্বদা তাকে ভারাক্রান্ত থাকতে হয় আশাহীনতা দ্বারা। জীবন থেকে নিজেকে আড়াল রাখতে হয়। কঠোর পরিশ্রমেও পরিশেষে তেমন কিছুই অর্জিত হয় না। গরীবদের এই দুরবস্থা প্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে একই কথা বলেছেন, "যেসকল মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তাদের চেয়ে আমরা যারা

স্বাভাবিক জীবন যাপন করি তাদের জীবন অসীম হারে উৎকৃষ্ট।"

তাহলে এ অবস্থা থেকে মুক্ত হবার উপায় কী হতে পারে। পিটার সিঙ্গারের খতিয়ে দেখা ধারণাসমূহ পরবর্তী অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হলো।

ছয়

দারিদ্র্য বিমোচনের পক্ষে সিঙ্গার-এর প্রধান যুক্তিসমূহ:

ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে সিঙ্গারের মৌলিক যুক্তিটি (the basic argument) এখানে উপস্থাপন করা হলো। সিঙ্গার জোরালোভাবে দাবি করেন, বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থাকে অনুদান দিতে আমরা বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতার যুক্তিকে তিনি মৌলিক যুক্তি (the basic argument) হিসেবে দাঁড় করান। নিম্নোক্ত কাঠামোয় তিনি যুক্তিটিকে দাঁড় করান :

প্রথম আশ্রয়বাক্য : খাদ্য, বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হলো বেঠিক।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য : যা থেকে মন্দ ঘটছে যদি আমাদের সেরকম কোনো ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকে তাহলে তা বিমোচনে এগিয়ে আসা উচিত। প্রয়োজনে ন্যূনতম কোনো ত্যাগ শিকার করে সাহায্য করাও নিকটতম জরুরি (nearly as important) কাজ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। আর আমরা যদি এভাবে কাজ না করতে পারি, কিংবা তা না করি তাহলে তা বেঠিক।

তৃতীয় আশ্রয়বাক্য : কোনো সাহায্যকারী সংস্থা গরীবদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে। আর খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসাসেবার অভাবের কারণে সংঘটিত মৃত্যুকে রোধ করতে পারি জরুরি কোনো ত্যাগ না করেই।

সিদ্ধান্ত : অতএব, তুমি যদি কোনো সাহায্যকারী সংস্থাকে দান না করো তাহলে সেটি অনুচিত হবে।

আমরা যদি আমাদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিত্য প্রয়োজনীয় অভাবসমূহ মেটাতে পারি তবেই কেবল দাবি করতে পারব যে, আমাদের খরচসমূহ খুশিমতো করেছি। আবার, কোনো একজন আগন্তুক যিনি আমাদের সমাজের সদস্য নয়, তাকে সাহায্য করি তাহলে একটি ভালো কাজ করেছি বলে দাবি করতে পারব। কিন্তু, আগন্তুককে সাহায্য করতে গিয়ে আমরা যেন নিজস্ব কমিউনিটির সদস্যদের কথা ভুলে না যাই। এপ্রসঙ্গে সিঙ্গারও বলছেন,

"আমরা যদি আমাদের উদ্বৃত্ত আয় কোনো গানের কনসার্টে, কিংবা কোনো ফ্যাশন প্রদর্শনীর জন্য, কিংবা খুব উন্নতমানের সুস্বাদু খাবারের জন্য, অথবা দামি মদের জন্য, অথবা বন্ধের দিনটি নতুন কোনো স্থানে ভ্রমণ করে খরচ করি তাহলে তা নিশ্চয়ই একটি মন্দ কাজ হবে। কিন্তু, এর ব্যতিক্রম কোনো কাজ করি তাহলে অনেকেই হয়তো হতবাক হতে পারেন, অভিনব মনে হতে পারে। আমাদের এই অভিনব কাজের মানসিকতা সৃষ্টি

করতে হবে।

অভিনব কাজটি হলো মানুষের জন্য কিছু করা। সাহায্য করা। ক্ষুধা ও দারিদ্রের কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত করা। সিঙ্গার দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রথাগত বিধি ও ধর্মীয় জীবনাচরণেও গরীবকে সাহায্য করার নির্দেশনা রয়েছে। তার যুক্তির কেন্দ্রীয় বক্তব্যও একইরকম। তিনি বলেন, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয়, ইহুদি ও ইসলামীয় শিক্ষার সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহায্য কোনো ঐচ্ছিক কাজ নয়, বরং এটি হলো বাধ্যতামূলক কাজ। সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে দেখিয়েছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ গরীবকে দান করার যিশুর শিক্ষাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন। টমাস একুইনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে সিঙ্গার বলেন, আমাদের যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি যেন আমরা অপচয় না করি, বরং আমাদের খরচের উদ্বৃত্ত অংশ যেন গরীবদের যেন ব্যয় করি। চার্চের ডাক্তার এমব্রোসের দৃষ্টান্ত ও Decretum Gratiani-এর বরাদ দিয়ে তিনি গরীবকে সাহায্য করার কথাই দাবি করেন।

সিঙ্গার জিউসদের নীতি-নৈতিকতা ও আইন সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থ Talmud এর উল্লেখ করে বলেন, উক্ত ধর্মগ্রন্থে নির্দেশ রয়েছে জিউস জনগণ অবশ্যই তাদের উপার্জিত আয়ের ১০% গরীবদের দান করবেন। এবিষয়টিকে হিব্রু ভাষায় tzedakah বলা হয়। যার আক্ষরিক অর্থ হলো charity বা দান । আভিধানিক অর্থে এটি আবার ন্যায়ও। একইভাবে মুসলমানগণও, যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তাদের অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করবে এরকম বিধান রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় স্বচ্ছল ব্যক্তিদের সংরক্ষিত সম্পদের (ক্যাশ কিংবা তরল সম্পদের) ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।

দান করার প্রসঙ্গটিকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য তিনি কনফুসীয় দার্শনিক মেনিকাসের উদাহরণ দেখান। একবার কিং হু'র কোনো এক রাজসভায় মেনিকাস জোরালোভাবে বলছেন, যদি তুমি রাস্তায় কোনো ব্যক্তিকে অভুক্ত বা দুর্ভিক্ষ অবস্থায় মরতে দেখ, তাহলে তোমার উচিত সেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে তোমার রক্ষিত শস্য থেকে দান করা। তুমি যখন দেখছ কেউ না খেয়ে মারা যাচ্ছে তখন তার মুখে খাবার তোলে দাও। কিন্তু, আমরা যখন কাউকে না খেয়ে মরতে দেখি তখন বলে থাকি "এ মৃত্যু আমার নয়, এটি অন্য কেউ ধারণ করছে। এখন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কাউকে তুমি ছুড়িকাবিদ্ধ করছ এবং কাউকে মেরে ফেলছ, যদি জানতে চাওয়া হয় এ দু'য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি-না তাহলে কী জবাব হবে। হয়তো তখন ঐ ব্যক্তি বলবে। ব্যক্তিটিকে আমি খুন করিনি, তাকে খুন করেছে ঐ অস্ত্রটি"। কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই তা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমরা সাহায্য করব অথবা করব না। এ পর্যায়ের আলোচনায় সিঙ্গার জানাতে চেয়েছেন : যদি উন্নত বিশ্বের জনগণের অল্প ও

সীমিত সাহায্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের শিশুদের বাঁচাতে পারে, তাহলে কেন তারা সেটা করবে না। সিঙ্গার এর পেছনে ছয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন :

ক. সনাক্তকৃত শিকার (the identifiable victim): অনেকে হয়তো দাবি করতে পারেন, আমরা যখন কারো জীবন বাঁচাতে চাইব অবশ্য তাকে চিনতে হবে, আমাদের কাছে পরিচিত হতে হবে। অনেক সময় কোনো গোষ্ঠী অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি যাকে চিনি তার জন্য আমরা কিছু করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি। কিংবা যাকে সাহায্য করব তার অবস্থা, দুরবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হই কেবল তাদেরকেই সাহায্য করতে চাই বলে। এ বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে সিঙ্গার পল স্লোভিকের গবেষণার সাহায্য নেন। স্লোভিক দুটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির (psychological systems) মধ্যে পার্থক্য দেখান :

১. আবেগপূর্ণ পদ্ধতি (affective system) ও

২. সুচিন্তিত পদ্ধতি (deliberative system)।

প্রথমত, পদ্ধতিটি ব্যক্তির আবেগর সঙ্গে সম্পৃক্ত,

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ব্যক্তির যুক্তি বা প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্যক্তিসত্তা প্রায় সময়ই আবেগপূর্ণ পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে থাকে। এই বাস্তবতায় ব্যক্তি যুক্তি বা প্রজ্ঞা অপেক্ষা আবেগের দিকে বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

খ. সংকীর্ণতা (narrowness): মনস্তাত্ত্বিক কারণে সকল সময়ই তার নিজের আত্মীয়, বন্ধুজন, এবং স্বদেশের জনগণের কথা চিন্তা করে থাকেন। সামর্থ্যবান মানুষদের থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানের জনগণের কথা তারা সাধারণত ভাবেন না। এই সংকীর্ণতার কারণে অনেকসময় দূরবর্তী রাষ্ট্রের গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য, পুষ্টিহীন শিশুদের জন্য সাহায্য করা হয়ে উঠে না।

গ. নিরর্থকতা (futility): সাধারণত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে আমরা সাহায্য করব। কিন্তু, অনেকের কাছে প্রশ্ন জাগতে পারে এটা কী অনর্থক হচ্ছে। অথবা কেন আমরা নিজ জনগোষ্ঠীর বাইরে অন্যদের সহযোগিতা করব। এসব প্রশ্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করা অথবা সাহায্য করা থেকে বিরত রাখে।

ঘ. দায়িত্বের অসংশ্লেষ বোধ (The diffusion of responsibility): অনেকসময় দেখা যায় আমাদের সমাজের অনেক ব্যক্তি যারা যথেষ্ট স্বচ্ছল অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে কিংবা ক্ষুধায়

---

28 Singer, , 2009. pp. 15-6.
29 Singer, 2009. p. 18.
30 Singer, 2009. pp. 19-20.
31 Singer, 2009, p. 21.
32 Mengzi [Mencius] Liang Hui Wang I, http://chinese.dsturgeon.net/text.pl|node=16028&if=en. Quoted in Singer, p. 22, accessed on 10 April.
33 Singer, 2009, pp. 46-50.

সীমিত সাহায্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের শিশুদের বাঁচাতে পারে, তাহলে কেন তারা সেটা করবে না। সিঙ্গার এর পেছনে ছয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন :

ক. সনাক্তকৃত শিকার (the identifiable victim): অনেকে হয়তো দাবি করতে পারেন, আমরা যখন কারো জীবন বাঁচাতে চাইব অবশ্য তাকে চিনতে হবে, আমাদের কাছে পরিচিত হতে হবে। অনেক সময় কোনো গোষ্ঠী অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি যাকে চিনি তার জন্য আমরা কিছু করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি। কিংবা যাকে সাহায্য করব তার অবস্থা, দুরবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হই কেবল তাদেরকেই সাহায্য করতে চাই বলে। এ বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে সিঙ্গার পল স্লোভিকের গবেষণার সাহায্য নেন। স্লোভিক দুটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির (psychological systems) মধ্যে পার্থক্য দেখান :

১. আবেগপূর্ণ পদ্ধতি (affective system) ও

২. সুচিন্তিত পদ্ধতি (deliberative system)।

প্রথমত, পদ্ধতিটি ব্যক্তির আবেগর সঙ্গে সম্পৃক্ত,

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ব্যক্তির যুক্তি বা প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্যক্তিসত্তা প্রায় সময়ই আবেগপূর্ণ পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে থাকে। এই বাস্তবতায় ব্যক্তি যুক্তি বা প্রজ্ঞা অপেক্ষা আবেগের দিকে বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

খ. সংকীর্ণতা (narrowness): মনস্তাত্ত্বিক কারণে সকল সময়ই তার নিজের আত্মীয়, বন্ধুজন, এবং স্বদেশের জনগণের কথা চিন্তা করে থাকেন। সামর্থ্যবান মানুষদের থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানের জনগণের কথা তারা সাধারণত ভাবেন না। এই সংকীর্ণতার কারণে অনেকসময় দূরবর্তী রাষ্ট্রের গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য, পুষ্টিহীন শিশুদের জন্য সাহায্য করা হয়ে উঠে না।

গ. নিরর্থকতা (futility): সাধারণত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে আমরা সাহায্য করব। কিন্তু, অনেকের কাছে প্রশ্ন জাগতে পারে এটা কী অনর্থক হচ্ছে। অথবা কেন আমরা নিজ জনগোষ্ঠীর বাইরে অন্যদের সহযোগিতা করব। এসব প্রশ্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করা অথবা সাহায্য করা থেকে বিরত রাখে।

ঘ. দায়িত্বের অসংশ্লেষ বোধ (The diffusion of responsibility): অনেকসময় দেখা যায় আমাদের সমাজের অনেক ব্যক্তি যারা যথেষ্ট স্বচ্ছল অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে কিংবা ক্ষুধায়

---

28 Singer, , 2009. pp. 15-6.
29 Singer, 2009. p. 18.
30 Singer, 2009. pp. 19-20.
31 Singer, 2009, p. 21.
32 Mengzi [Mencius] Liang Hui Wang I, http://chinese.dsturgeon.net/text.pl|node=16028&if=en. Quoted in Singer, p. 22, accessed on 10 April.
33 Singer, 2009, pp. 46-50.

আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সাহায্য করছেন না তখন অন্যরাও সাহায্য থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অর্থাৎ অন্যদের দায়িত্ববোধের সঙ্গে ব্যক্তি তার দায়িত্ববোধকে মিলিয়ে দেখেন। এই বোধটি অনেকটা সহানুভূতিমূলক। দেখা গেল কোনো সমাজের জনগণের অধিকাংশই পরোপকারী। তন্মধ্যে গুটিকতেক রয়েছেন যারা সাহায্য বা অনুদান সম্পর্কে খুব একটা ধারণা রাখেন না। কিন্তু তারাও দান করেন একারণে যে ঐ সমাজের অধিকাংশ জনগণই দান করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সমাজের অনেকে যেহেতু দান করে না, সেহেতু দায়িত্বের এই অসংশ্লেষাত্মক বোধের সঙ্গে বাকীরা একাত্ম হয়ে দান করা থেকে বিরত থাকেন।

চ. ন্যায্যতার মনোভাবের অভাব (lack of sense of fairness): ন্যায্যতার মনোভাব ব্যক্তির মধ্যে একদিকে যেমন সমতার নীতি অনুসারে কাজ করতে বলে, অন্যদিকে জাত, বর্ণ, গোত্র ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করে। কিন্তু, ব্যক্তিগণ প্রায়ই জাতীয়তাবাদী চেতনার বলয়ে, কিংবা সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদী প্রভাবে থেকে সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তারা মনে করেন, নিজ জাতিগোষ্ঠীর কথা না ভেবে, দুরবর্তী অথবা ভিন্ন জাতির জন্য অর্থ বরাদ্দ কিংবা সহযোগিতা করা অযৌক্তিক।

ছ. অর্থ বা মানি (money): প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই অর্থের প্রতি সদয় মনোভাব রয়েছে। একারণেই কেউই চায় না অন্যদের দান করে তার অর্থ নিঃশেষ হয়ে যাক। তারা মনে করেন, অর্থের সমৃদ্ধি ব্যক্তিকে যথেষ্ট স্বাবলম্বী করে তোলে। এ মানসিকতার কারণে অনেকেই সাহায্য করে না।

কেন আমরা অধিক সাহায্য করব না। এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, উপর্যুক্ত ছয়টি কারণে কেউ হয়তো দাবি করতে পারেন এসব মনস্তাত্ত্বিক কারণে কাউকে দান বা সাহায্য করা আমাদের স্বভাবগত নয়। মানব চরিত্রে কেন এরকম আচরণের দিকে ঝুঁকতে পছন্দ করে তা হয়তো একসময় মানুষের কাছে বোধগম্য হবে। তাই বলে উপর্যুক্ত যুক্তিসমূহের সাহায্য নিয়ে কেউ বলতে পারবে না তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে সাহায্য করবে না। অসংখ্য দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে দেখানো যাবে যে, মানুষ বৌদ্ধিকভাবে অনুদান করার জন্য প্রভাবিত হতে পারে। The New York Times এর জন্য লিখিত এক নিবন্ধে সিঙ্গার উল্লেখ করেন, অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা UNICEF কিংবা আমেরিকানভিত্তিক অক্সফাম সংস্থায় সাহায্য পাঠান, অনুদান দিয়ে থাকেন। এসব সংস্থা পিটার সিঙ্গারকে জানিয়েছেন, নিবন্ধটি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে ফোনে সাহায্য করার পরিমাণ বেড়ে ৳৬০০,০০০ দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হলো নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বচ্ছল মানুষকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনেক অনুদানকারীগণ এখনও সে সাহায্য অব্যাহত রেখেছেন। প্রশ্ন হলো এসব অনুদানের মূল্যায়ন করব কীভাবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে অনুদান মূল্যায়ন-এর কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সাত

৭.১ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অনুদান : কয়েকটি সীমাবদ্ধতা

সিঙ্গার মনে করেন অনুদান বা চ্যারিটি প্রদানের বড় সংকট হলো এর প্রভাবের খতিয়ানটি অনেকসময় বোঝা যায় না। ধরা যাক, কোনো একটি সাহায্যদানকারী সংস্থা বৈশ্বিক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষে কাজ করছে। উক্ত সংস্থাটি তাদের ব্যয় হ্রাস করানোর জন্য স্টাফ সংখ্যা কমিয়ে আনে। তবে যেসব স্টাফদের সংখ্যা তারা কমিয়েছেন তাদের সাহায্য বা অনুদান প্রদানের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রয়েছে। ফলে সংস্থাটি তাদের প্রশাসনিক কাজে লোকবল কমিয়ে এনে যে অর্থ উদ্বৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে, সেই উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে আরো বেশিসংখ্যক গরীব মানুষের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করা সম্ভব। কিন্তু, বিশেষজ্ঞ স্টাফ কমানোর ফলে সংস্থাটি তাদের অনুদান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় ভুল ত্রুটি করতে পারে। এ ত্রুটির ফলে গোটা সাহায্য দান প্রক্রিয়াটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কারণ কোনো একটি প্রজেক্টের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অবশ্যই উচু দক্ষতাসম্পন্ন স্টাফ বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে। গোটা প্রজেক্টটি সচল রাখার জন্য বিশেষজ্ঞ স্টাফদের পেছনে অর্থ ব্যয় হতে পারে। এই ব্যয়টিও গোটা প্রজেক্টের সফলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, চ্যারিটি মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ মূল্যায়ন গোটা কর্মতৎপরতাকে আরো সফলভাবে করতে সাহায্য করবে। চ্যারিটির কর্মসফলতা বা মূল্যায়নের জন্য সিঙ্গার পুনঃপুন নিয়ন্ত্রণ ট্রায়াল (random controlled trials) ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। তবে অনেক চ্যারিটি সংস্থা হয়তো মূল্যায়নের এই পরীক্ষাটি নাও করতে পারে। তারা মনে করতে পারেন মূল্যায়নের এই ধারাটির ফলে সংস্থার ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।

সিঙ্গার বিশ্বাস করেন চ্যারিটির কার্যক্রমসমূহ যথার্থভাবে বা সফলভাবে হচ্ছে কি-না তা মূল্যায়নের জন্য ঐ ট্রায়াল পদ্ধতিটি ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন,

"অনেক মানুষকে নিয়ে কোনো সাহায্য করার প্রজেক্ট গ্রহণ করার চেয়ে স্বল্পসংখ্যক মানুষকে নিয়ে ফলপ্রসূ প্রজেক্ট অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রজেক্ট পরিচালনার জন্য, প্রজেক্টের মূল্যায়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা প্রজেক্টের মূল লক্ষে বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। একটি সফল প্রজেক্টের জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যায়কে অবশ্যই বিবেচনা রাখতে হবে। সুতরাং, অনেকের দারিদ্র্য বিমোচনের দায়িত্ব অসফলভাবে পালনের চেয়ে অল্প কয়েকজনকে সফলভাবে দারিদ্র্যের আওতার বাইরে আনা খুবই জরুরি।"

অনেক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা লাভও বয়ে আনতে পারে। কিন্তু, সংখ্যার বিবেচনায় তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে। তবে প্রত্যেকটি সাহায্যের লক্ষ হওয়া উচিত সামর্থ্য নির্মাণ (capacity building)। এর আওতায় গুরুত্ব পাবে দুটি বিষয়:

প্রথমত. গরীবকে সাহায্য করতে হবে এই লক্ষে, তারা যেন আত্মস্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নারীদের নানা ইস্যুতে সহায়তা দিতে হবে এই লক্ষে তারা যেন তাদের আইনগত অধিকারসমূহ আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সিঙ্গার মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্টের (MVP) কথা বলেন। এই প্রজেক্টটি প্রস্তাবক ছিলেন অর্থনীতিবিদ জেফরি সাক্সস (Jeffry Sachs)। উক্ত প্রজেক্ট আমাদের শিখিয়েছে একই সঙ্গে কীভাবে বহুবিধ ধারায় সাহায্য করা যায়। মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্টে পরামর্শসমূহ হলো। গরীব জনগোষ্ঠীকে বিশুদ্ধ পানীয় পানের ব্যবস্থা করা, শিশুদের জন্য ভিটামিন ও বিশুদ্ধ পানীয় পানের সুব্যবস্থা করা, শিশুদের জন্য বিভিন্ন টীকা দান কর্মসূচি গ্রহণ করা, বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা, শিশুদের ভেতরকার পরজীবী নাশ করার জন্য কৃমিনাশকের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই প্রজেক্টে আরো সুপারিশ করা হয় । প্রতিবছর প্রতি গরীব ব্যক্তিকে ন্যুনতম ৳১১০.০০ সাহায্য প্রদান করা উচিত। তন্মধ্যে গ্রাম থেকে আসা গরীবজনদের জন্য ৳১০.০০ রাখতে হবে। যদি দেখা যায়। এই প্রক্রিয়াটি যথার্থভাবে কাজে লাগছে না, তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। সাহায্য যে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগছে তা বোঝার উপায় কি। সিঙ্গার বলছেন, তা বোঝার উপায় হলো জীবনের গুণগত মানের প্রদত্ত ইনডেক্সসমূহ লক্ষ করা। সাহায্য পাবার ফলে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্যীয় হতে হবে:

১. তাদের ফসল উৎপাদনে উন্নয়ন করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে,

২. নারীরা তাদের সামাজিক কাজকর্মে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারার স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে,

৩. আগের চেয়ে বালিকা শিশুদের বিদ্যালয়ে যাবার সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি পেতে হবে,

৪.শিশুদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সেবনের মাধ্যমে ডায়েরিয়াজনিত রোগ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে,

৫. সংক্রামক ব্যাধিসমূহ, যেমন, যক্ষা, কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগসমূহকে টীকা প্রতিষেধকের আওতায় এনে অপ্রত্যাশিত শিশু মৃত্যু রোধ করার সফলতা অর্জন করতে হবে।

34 Singer, 2009, pp. 50-2.
35 Singer, 2009, pp. 53-4.
36 Singer, 2009, pp. 56-9.
37 Singer, 2009, pp. 59-61.
38 Singer, 2009, p. 83|
39 Singer, 2009, p. 94.
40 Singer, 2009, p. 94.

সাহায্য যদি উপর্যুক্ত শর্তসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হয় তবেই বোঝা যাবে যে, দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য বা অনুদান কাজে লাগছে। তিনি আশা করছেন আগামী ২০১০-২০১২ সনের (উল্লেখ্য যে তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন ২০০৯ সালে) মধ্যে এই প্রজেক্টটি ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন। মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্ট -এর মুল লক্ষ্যসমূহ দেখা যাক :

ডায়াগ্রাম ৬: মিলেনিয়াম ভিলেজ এর

লক্ষ্য-১: চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচন করতে হবে।
লক্ষ্য-২: সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা অর্জন করতে হবে।
লক্ষ্য-৩: লিঙ্গ সমতার উন্নয়ন করতে হবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে।
লক্ষ্য-৪: শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হবে।
লক্ষ্য-৫: মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করতে হবে।
লক্ষ্য-৬: এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হবে।
লক্ষ্য-৭: পরিবেশগত ধারণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।
লক্ষ্য-৮: উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক-অংশীদারিত্ব আরো বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে এই প্রজেক্টের আওতায় যেসব লক্ষসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে তা কতোটা অর্জিত হয়েছে। কিংবা এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে কতোটা অগ্রসর হতে পেরেছি। এসব সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মিলেনিয়াম প্রজেক্ট গত জুন ২০১২ সালে তাদের ওয়েব্সাইটে জানায় : অনেক রাষ্ট্রই বিশ্বায়ন থেকে ফল পাচ্ছে। পাশাপাশি তারা দাবি করছেন, তাদের দেয় নির্ধারিত সময়সীমা ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষসমূহ অর্জনে সফল হবেন। বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুসারে, ১৯৮১ থেকে ২০০১ সালে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করা জনসংখ্যা কমে আসছে। তাদের হিসেব অনুসারে সেটা ১.৫ বিলিয়ন থেকে ১.১ বিলিয়নে নেমে এসেছে। অনেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে চরম দারিদ্র্য (extreme poverty) ৪০ শতাংশ থেকে নেমে ২১ শতাংশে এসেছে।

পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অংশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানিকতায় ব্যাপক অসমতা রয়েছে। অনেক রাষ্ট্রই মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্টের অধিকাংশ লক্ষই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। আবার অনেক রাষ্ট্র এমনকী একই রাষ্ট্রের ভেতরের বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে ন্যুনতম লক্ষসমূহ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সাব-সাহারান আফ্রিকায় চরম দারিদ্র্য এতোটা প্রকট যে, সেখানে মা ও শিশু মৃত্যুর হার খুবই উচুঁ। এশিয়ার অনেক রাষ্ট্র যদিও দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, তথাপি শতমিলিয়ন জনগোষ্ঠী এখনও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। আবার লাটিন আমেরিকা, মধ্য

এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে মিলেনিয়াম লক্ষসমূহ খুবই মন্তর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও এই গতি খুবই নিম্নমানের।

পিটার সিঙ্গার কোনোপ্রকার আনুষ্ঠানিক সমীক্ষা না করেই সাহায্যের বেশকিছু বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত উদাহরণের প্রথমটি হলো : হস্তচালিত পাম্প মেশিনের সফল চালনায় অভ্যস্ত হওয়া। হস্তচালিত পাম্প- মেশিন চালনায় নারী ও পুরুষের দক্ষতা অর্জনের ফলে তারা দৈনিক তিন থেকে চার ঘন্টা সময় রক্ষা করতে পারছেন। অল্প আয়েসে খাবার পানি সংগ্রহ করতে পারছেন। এতে করে কন্যা-সন্তানেরা কাজ করেও বিদ্যালয়ে যেতে পারছে। দ্বিতীয়ত, সাহায্যের অর্থে প্রচুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার ফলে কোনোপ্রকার আপত্তি ব্যতীতই কন্যা-সন্তানেরা ছেলে-সন্তানদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে। তৃতীয় উদাহরণে সিঙ্গার বলেন, এই সাহায্য আওতায় অনেক অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। এই হলো বৈদেশিক সাহায্যের সফলতার কয়েকটি নমুনা।

তবে সিঙ্গার এটাও উল্লেখ করেন যে, মিলেনিয়াম প্রজেক্ট অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। যেমন দক্ষি এশিয়ার কোনো রাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন রাজ্য বা জেলায় সাহায্য সফলভাবে কাজ করলেও অনেক প্রত্যন্ত এলাকা, দারিদ্র্য ঘনত্ব এলাকায় মিলেনিয়াম প্রজেক্টের লক্ষসমূহ বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ এখনও লক্ষ করা যায়নি। বিশেষ করে ভারতের সেভেন সিস্টার খ্যাত রাজ্যসমূহ এখনও এসব লক্ষ্য অর্জিত হবার প্রচেষ্টায় ঢুকেনি। বাংলাদেশের খড়া আক্রান্ত জেলাসমূহ, হাওড় ও প্রান্তিক এলাকায় বিদেশী সাহায্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি।

ক্ষুধা ও দারিদ্রের আরেকটি কারণ হলো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা বা অন্ধত্ব। অথচ অন্ধত্ব দূর করার জন্য এখনও কোনো সক্রিয় বা ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গরীব রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়নি। অন্ধ নাগরিকগণ সফলভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। গরীব দেশে অসামর্থ্যবান জনগণদের সমর্থন দেবার মতো ভালো কোনো ব্যবস্থাও নেই। ফলে তারা কোনো কাজ সুচারুভাবে করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন সাহায্যের অর্থের দ্বারা তাদের সফল চিকিৎসা করার পদক্ষেপ নেওয়া।

বেশকিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় । অন্ধ ব্যক্তিগণ দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তাদের জীবনমান বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়ে উঠছে। অন্যন্য সক্ষম জনগোষ্ঠীর মতো তারাও কর্মঠ হয়ে উঠছে। সাহায্যের মধ্যে আরেকটি হলো ক্ষুদ্রঋণ। ধনী রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সাহায্য থেকে তারা যে ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে, তা দ্বারা অধিকাংশ গরীব মানুষই ছোট ছোট ব্যবসা দাঁড় করাতে সক্ষম হচ্ছে। অনেকে আবার সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারছে। আবার অনেকে যারা অপেক্ষাকৃত কম সফল তারাও মোটামুটি খেতে, পড়তে ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে

41 Singer, 2009, pp. 119-20.

42 Singer, 2009, p. 120.

৪৩ এই আলোচনার জন্য দেখুন Millennium Project, <http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm>)

পারছে। যেমন, যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার পরিবার গরু কিংবা ছাগল বিক্রি করে তাকে ডাক্তার দেখাতে পারছে, ঔষধ কিনতে পারছে। এভাবে সাহায্যের আওতায় পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প বিদ্যমান থাকার ফলে ঐসব জনগোষ্ঠীর জীবনের সবথেকে মূল্যবান জিনিসপত্রাদি বিক্রি করতে হয় না। এমনকী তাদেরকে চরম দারিদ্রের মধ্যেও ডুবে থাকতে হয় না।

৭.২ সাহায্য প্রদানের সংকট ও সিঙ্গারের আরো কয়েকটি সমাধান

প্রশ্ন হলো কেন আমরা সাহায্য করব। সিঙ্গার এপ্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে নৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু, একজন ব্যক্তি কেন এই বাধ্যবাধকতায় তার নিজেকে আবদ্ধ করবেন। এরকম সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গার মূলত দুটি সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন:

প্রথমটি হলো আমরা কীভাবে উদ্ভূত সমস্যার অংশ হতে পারি।

দ্বিতীয়টি হলো আমরা কতোটুকু সাহায্য দিতে বাধ্য থাকব।

পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত পিটার সিঙ্গার-এর বিশ্লেষণ আলোকপাত করা হবে।

ক. আমরা কী করতে পারি। সমস্যা সমাধানের অংশ হতে পারি।

গরীব দেশের মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। সিঙ্গার একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। যেমন, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগবাহিত মশার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মশারি ব্যবহার করতে হয়। যেমন, মশারি তৈরী করতে হয়তো ৳১০.০০ লাগছে। যারা মশারি ব্যবহার করছে তাদের অধিকাংশই ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে। সুতরাং, কেউ যদি ভাবেন সে তার জীবনকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করবেন তাহলে তাকে অবশ্যই ১০ ডলার খরচ করতে হবে। যদিও জীবন রক্ষার জন্য ৳১০.০০ খরচ করে অনেকে হয়তো ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতেও পারেন। তারপরও তিনি জীবন রক্ষার জন্য এই অর্থটি খরচ করতে পারেন। অর্থনীতিবিদ জেফরি সেক্সসের কার্যকারিতার প্রাক্কলন (estimate of the effectiveness) অনুসরণ করে সিঙ্গার হিসেব-নিকেশ করে দেখিয়েছেন, ৳১০.০০ খরচ করার ফলে সে জীবন রক্ষার জন্য নীট লাভ পাচ্ছে ৳২০০.০০। কারণ যদি সে মশারি ব্যবহার না করে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে রোগ সারাতে তার খরচ করতে হবে ২০০ ডলার। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য সিঙ্গার আরো একটি উদাহরণের সাহায্য নেন। একজন ব্যক্তি ১০ ডলার খরচ করে, আরো ১৯০ ডলার সংরক্ষু করতে পারছে। ৳১০.০০ অবদান রেখে সে উনিশজন ব্যক্তির জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে পারছে। এই খরচ করার পরেও কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে তার জীবন রক্ষা হচ্ছে। কিন্তু, এদের মধ্যে কোনো একজন যদি মশারী কেনা বাবদ ৳১০.০০ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ

ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. আমরা কতোটুকু সাহায্য দিতে বাধ্য থাকব।

উপর্যুক্ত আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে সিঙ্গার আরেকটি প্রশ্ন দাঁড় করান। সাহায্যের কী কোনো বিকল্প থাকতে পারে। সিঙ্গার বলছেন, একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তি হয়তো চিন্তা করেছেন, তিনি যদি সাহায্য না করেন অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করবেই। কিংবা কোনো ধনী রাষ্ট্র হয়তো ভাবল তারা যদি সাহায্য না করে, অন্য ধনী রাষ্ট্র হয়তো তা করবে। এতে করে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত কেউই সাহায্যে এগিয়ে আসলো না। সাহায্য প্রদানে যদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে তাহলে এ সমস্যাটির একটি সমাধান দাঁড় করানো সহজ হবে। ধরা যাক, কোনো একজন ধনী ব্যক্তি সাহায্যের টাকা দিতে ব্যর্থ হলেন, এটি ইঙ্গিত করে না যে, তার পরিবর্তে অন্য কেউ সাহায্যের অর্থ দিয়ে দিবে। এখন প্রশ্ন হলো যদি গরীবদেরকে সাহায্য করতে হয়, তাহলে একজন ব্যক্তির সাহায্য হিসেবে কতো টাকা দেওয়া উচিত। সিঙ্গার তাঁর The Life You Can Save গ্রন্থের Asking Too Much অধ্যায়ে এ প্রশ্নের একটি বিবেচনা দাঁড় করিয়েছেন।

একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। ধরা যাক, তুমি একটি অগভীর পুকুরের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে তুমি দেখলে দশটি শিশু সাতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে এবং তাদেরকে উদ্ধার করা খুব জরুরি। চারপাশ তাকিয়ে দেখা গেল শিশুদের সঙ্গে পিতামাতা বা তাদের পরিচর্যাকারী কেউ নেই। এর মধ্যে আরো নয়জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক এসে পুকুরে উপস্থিত এবং তারাও লক্ষ করল শিশুরা ডুবে যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ শিশু পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তুমি শিশুদের বাঁচানোর জন্য পানিতে নামলে, তাদেরকে হাতের নাগালে নিয়ে আসলে। এক্ষেত্রে হয়তো তুমি প্রত্যাশা করতে পার যে, নয়জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে সকলেই তার মতো পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখবে। এতে করে সকলের সাহায্য পেয়ে সকল শিশুরই জীবন রক্ষা পাবে। তন্মধ্যে লক্ষ করা গেল মাত্র চারজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের পুনরুদ্ধারে কাজ করছে, বাকী পাঁচজন পুকুরের পাড়ে পায়চারি করছে। কিন্তু, আরো পাঁচটি শিশু প্রায় ডুবে যাচ্ছে যাদেরকে উদ্ধার করা খুবই জরুরি। এখন আমরা যদি ন্যায্য অংশীদার তত্ত্ব (theory of fair-share) অনুসারে বিষয়টি বিবেচনা করি তাহলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের করণীয় কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করব এই প্রতিশ্রুতি থাকা উচিত। অর্থাৎ উল্লিখিত ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্যদের মতো শিশুদের জীবন রক্ষায় পুকুরে নামব। এখন প্রত্যেকেই যদি তার নিজ নিজ কাজটি সম্পন্ন করে তাহলে শিশুরা বেঁচে যাবে।

উপর্যুক্ত ঘটনায় আপাতত মনে হতে পারে পুকুরের কাছে থাকা দশজন ব্যক্তি দশটি শিশুকে পুকুরের জলে ডোবা থেকে সাহায্য করলো। এতে করে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায্য

45 Singer, 2009, p. 92.

অংশীদারিত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ তোমার ন্যায্য অংশীদারিত্ব হলো একটি শিশুকে রক্ষা করা। এ দায়িত্বটি পালন করার মধ্য দিয়ে তোমার এর অধিক কিছুই করার বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু, তুমি ও বাকী চারজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পাঁচটি শিশুকে উদ্ধার করেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। যেখানে আরো পাঁচটি শিশু প্রায় ডুবে যাচ্ছে। সিঙ্গার মনে করেন, তা করার প্রয়োজন নেই। বরং উক্ত পাঁচজন ব্যক্তিরই উচিত তাদেরকে উদ্ধার করার কাজে নিয়োজিত হওয়া। কারণ ন্যায্য অংশীদারিত্বের কথা চিন্তা করে তাদের উচিত হবে না পাঁচটি শিশুকে মরতে দেওয়া। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায়। প্রত্যেকটি স্বচ্ছল ব্যক্তিরই ন্যায্যতার অংশীদারিত্বের কারণে উচিত গরীবদের জীবন বাঁচানো। তবে অন্য কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ যদি একাজটি না করেন তাহলে তার উচিত হবে না সাহায্য বা অনুদান বন্ধ করে দেওয়া।

সিঙ্গারের প্রশ্ন হলো আমরা কতোটুকু দিতে বাধ্য থাকিব। এপ্রসঙ্গে তিনি সমকালীন তিনজন দার্শনিক রিচার্ড মিলার, গ্যারেট কালিস্নটি ও ব্রাড হুকার প্রমুখের তত্ত্ব পর্যালোচনা করেন। প্রথমেই তিনি রিচার্ড মিলারের যুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, মিলার চিন্তা করেছেন, "গরীবদের সাহায্য করার ব্যাপারে আমাদের একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে হবে, সেটি হলো আমরা যদি কেউ বেশি সাহায্য করি তাহলে আমাদের জীবনের মূল্য ও মান গুরুত্বপূর্ণভাবে নিচে নেমে আসবে, অধোপতিত হবে। আমরা কেউই যেন এই শর্তটির বাইরে না যাই।" গ্যারেট কালিস্নটির তত্ত্ব প্রসঙ্গে সিঙ্গার বলেন,

তিনি চরমভাবে বিশ্বাস করে সাহায্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের অবদান রাখা উচিত। যেমন অন্তর্নিহিতভাবে জীবন-প্ররোচনাকারী জিনিস (intrinsically life-enhancing goods): যেমন বন্ধুত্ব, কারো সংগীত বিষয়ক জ্ঞান বিকাশের জন্য সাহায্য করা, এমনকী নিজ সমাজের কারো জীবনকে উচ্ছ্বসিত করার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা উচিত"।

পরিশেষে সিঙ্গার হুকারের দার্শনিক অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

"হুকার যুক্তি দেন যে, আমাদের সেই রীতিতে কাজ করা উচিত যাতে করে আমরা

---

46 Singer, 2009, pp. 144-5.

৪৭ এই তত্ত্ব অনুসারে আমরা যখন কোনো কাজে অংশগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতায় থাকি তখন অবশ্যই সেখঅনে ন্যায্যতার স্বাক্ষও রাখব।

48 Miller, Richard, 2004, ÒBeneficence, Duty and DistanceÓ, Philosphy and Public Affairs, pp.357-43.

49 Cullity, Garret, 2004. The Moral Demand of Affluence, Oxford: Oxford University Press.

50 Hooker, Brad, 2000. Ideal Code, Real World: A Rule Consequentialist Theory of Morality, Oxford. UK : Clarendon Press.

51 Cf. Singer, 2009. pp. 146-7.

52 Cf. Singer, 2009. p. 147.

53 Cf. Singer, 2009. p. 147.

সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধন করতে পারি। হুকার আরো বলেন, আমরা নৈতিকভাবে বাধ্য গরীবদের জরুরি প্রয়োজনসমূহ মেটানোয় ভূমিকা রাখতে। যদি আমাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় তাও সাহায্য করার বাধ্যবাধকতায় থাকা উচিত"।

তবে সিঙ্গার স্বীকার করেন, উল্লিখিত তিনজন দার্শনিকের তাত্ত্বিক অবস্থান ন্যায্যতার অংশীদারিত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট। তিনটি তত্ত্বই অসংগতিপূর্ণ ও ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রসঙ্গের সূত্রধরে সিঙ্গার বলেন, আমাদের সমাজের অনেক মানুষই রয়েছে যারা ভালো জামা-কাপড় পরিধান করে, ভালো খাবার গ্রহণ করে এবং ভালো স্টেরিও সিস্টেমে গান শুনে আনন্দ পান। যদি সকলকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা সকলকিছুর উর্ধ্বে সুখকে প্রাধান্য দিতে পারি। কিন্তু, তারপরও আমরা বলব রিচার্ড মিলার, গ্যারেট কাল্লিটি এবং ব্রাড হুকারের যুক্তির যথেষ্ট দার্শনিক গুরুত্ব রয়েছে। তাঁরা তিনজনই মনে করেছেন, আমাদের নিজেদের অর্থ নিজেদের মতো করে খরচ করার স্বত্ত্বাধিকার কেবল আমাদেরই (যারা বিত্তবান) রয়েছে।

সিঙ্গার দাবি করেন, অবশ্যই ব্যক্তির নিজের অর্থ নিজের মতো খরচ করার অধিকার রাখে। কিন্তু, এই খরচের পরিবর্তে আমরা যদি উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কারো দুঃখ ঘোচাতে পারি, মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি, কিংবা কাউকে বড় কোনো যন্ত্রণা ও ক্লিশকায় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি, সেক্ষেত্রে নিজের অর্থ খরচ করার চেয়ে কাউকে দান করা অনেক উত্তম। অনেক চরম অবস্থা আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কিন্তু, কেউ যদি মনে করেন একটি উন্নত গুণগতমানসম্পন্ন স্টেরিও যন্ত্র আমাদের জীবনের জন্য সুখকর হবে, জীবন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হবে তাহলে আমরা হয়তো সেটাই করব, এক্ষেত্রে হয়তো কে মরল বা কার জীবন সংরক্ষিত হলো সে বিবেচনা গৌণ হয়ে দাঁড়াবে। এরকম মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করা কী নৈতিক। কিংবা এরকম জীবন যাপনের প্রয়াস কী "মানবজীবনের সমান মূল্য" এ নীতির সঙ্গে তামাসা করার সমতূল্য নয়। পিটার সিঙ্গার এরকম প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন The Life You Can Save গ্রন্থের The Realistic অধ্যায়ে। উক্ত অধ্যায়ে তিনি বলেন, ধনী ব্যক্তিদের অবশ্যই গরীবদের জন্য সাহায্য করার বাধ্যবাধকতায় থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো এ বাধ্যবাধকতা কীভাবে বণ্টন করা হবে।

৭.৩ সাহায্যের আনুপাতিক বণ্টন

ধনী কিংবা স্বচ্ছল ব্যক্তিরা কীভাবে গরীবদের জন্য সাহায্য বণ্টন করবেন। এরকম সমস্যায় সিঙ্গার যে সমাধান দিয়েছেন তা সংক্ষেপে উলেস্নখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের উচিত "যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল, কিংবা যারা খুবই ধনী তাদের সকলের উচিত বাৎসরিক আয় থেকে ৫% অনুদান করা। এরকম বাস্তবতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, যতো বেশি আয় করবে, ততো বেশি তুমি দান করতে পারবে। এটি শুধু ডলারের অর্থে নয়, বরং তোমার আয়ের শতকরা হিসেবে। যদি কেউ

$৫০০০০০ আয় করে, তাহলে সেখান থেকে যদি ৫% অনুদান করে তাহলে সেটা ঐ ব্যক্তির জন্য তেমন কষ্টদায়ক কিছু হবে না। কেননা বাকী অর্থ দিয়ে ঐ ব্যক্তি অনেক ভালো দিন যাপন করতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি $৫০,০০০ আয় করে, আর সেখান থেকে অনুদান বা সাহায্য হিসেবে $২,৫০০ দিয়ে দিতে হয়, তাহলে এটা হয়তো তার জন্য কষ্টদায়ক হবে। সুতরাং, এক্ষেত্রে সিঙ্গারের পরামর্শ হলো অপেক্ষাকৃত গরীব ও হতদরিদ্র কিংবা কম-আয়ের রাষ্টসমূহের জনগণকে ধনী রাষ্ট্র তাদের মুল আয়ের ৫% অনুদান হিসেবে দেয় তাহলে অনায়াসে গরীব মানুষ দারিদ্র্য মোকাবেলা করতে পারবে। এতে করে কারো উপরই তেমন কোনো চাপ সৃষ্টি হবে না।

কীভাবে গরীব জনগণকে ধনীরা সাহায্য করবে পিটার সিঙ্গার তার একটা গাণিতিক সমাধানও দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্নরকম অনুদানের শতকরা হিসেবের প্রস্তাব করেছেন। যেমন, যাদের আয় $১০৫,০০১ থেকে $১৪৮,০০০ পর্যন্ত তারা অবশ্যই তাদের আয়ের ৫% অনুদান করবে। কিন্তু, যাদের আয় $১৪৮,০০১ থেকে $৩৮৩,০০০ পর্যন্ত তারা প্রথম $১৪৮,০০০ এর ৫% অনুদান দিবেন, এবং বাকী অর্থের ১০% অনুদান দিবেন। আবার যাদের আয় $৩৮৩,০০১ থেকে $৬০০,০০০ পর্যন্ত অবশ্যই আয়ের প্রথম $১৪৮,০০১ এর জন্য ৫%, পরবর্তী $২৩৫,০০০ এর জন্য ১০% এবং বাকী অর্থ থেকে ১৫% অনুদান দিতে হবে। কিন্তু, যাদের আয় $১০.৭ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে তারা অবশ্যই আয়ের $১৪৮,০০১ এর জন্য ৫%, পরবর্তী $২৩৫,০০০ এর জন্য ১০%, এবং $২১৭,০০০ এর জন্য ১৫%, অবশিষ্ট $১.৩ মিলিয়নের জন্য ২০%, $৮.৮ মিলিয়নের জন্য ২৫%, এবং অবশিষ্ট অর্থের জন্য ৩৩.৩৩% অর্থ অনুদান করবে। সিঙ্গার খুব জোরালোভাবে দাবি করেন, যদি জনগণ এই হারে অনুদান দেয় তাহলে প্রতি বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য $৪৭১ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

৭.৪ মিলেনিয়াম প্রজেক্ট প্রসঙ্গে সিঙ্গার. অর্থনীতিবিদ স্যাক্সসের প্রস্তাবনা অনুসারে মিলেনিয়াম প্রজেক্টের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সংগৃহীত এই অর্থ থেকে সবেমাত্র $১৮৯ ব্যয় করতে হবে। আরো উদ্বৃত্ত থেকে যাবে $২৮২ বিলিয়ন। এই অর্থ সারা পৃথিবীর গরীবদের জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত কিছু করা সম্ভব হবে। সিঙ্গার মনে করেন, অন্য রাষ্ট্রের ধনী ব্যক্তিদের গরীব রাষ্ট্রের গরীব জনগণের বোঝা মাথায় নিলেই কেবল সারা পৃথিবীর দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে। উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের কেবল এক তৃতীয়াংশ অর্থ আসতে পারে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ প্রেক্ষাপটে সিঙ্গার পরামর্শ দেন যে, বিশ্ব পর্যায়ে ধনী ব্যক্তিরা $১.৫ ট্রিলিয়ন অর্থ প্রতিবছর উন্নয়ন খাতে সাহায্য করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যেতে পারে ইউনেস্কো প্রদত্ত

54 Cf. Singer, 2009. p. 147.
55 Singer, 2009. pp. 148.
56 Singer, 2009. pp. 152, 162, 164, 165.
57 Singer, 2009. p. 167.

সাহায্য রীতি, কিংবা কোনো রাষ্ট্রের সাহায্য প্রোগ্রাম কার্যকর নাও হতে পারে। এররম বাস্তবতায় আমাদের কী করণীয় আছে। এ অবস্থা উত্তরণের উপায় কী। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সিঙ্গার সাতটি শর্তের প্রস্তাব করেন যা দ্বারা দারিদ্র্য সংল্লিষ্ট সমস্যাসমূহ বিমোচন করা যায়। তাঁর প্রস্তাবিত সাতটি শর্ত দেখা যাক :

১. এসব মানদ-সমূহ মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হবে।

২. আমাদের কী করণীয় সেই লক্ষে www.The Life You Can Save.com ওয়েবসাইটটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রয়োজনে নিজেরাও এ বিষয়ে গবেষণা করতে পারি যার উপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব কোনধরনের সংগঠন বা সংস্থাসমূহকে সাহায্য করব কিংবা করব না।

৩. বিগত আয়কর রিটার্ণ মোতাবেক প্রতিবছর আমাদেরকে কতো সাহায্য করতে হবে সেই হিসেবটি দাঁড় করাতে হবে। কিংবা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কীভাবে আমরা সেই অনুদানটি প্রদান করব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন রয়েছে। সেটি কী মাসিক হবে, নাকি ত্রৈমাসিক, কিংবা অর্ধবার্ষিক অথবা বার্ষিক। যেটি আমাদের জন্য উত্তম হয় সেই সিদ্ধান্তটিই আমরা নিতে পারি। সেই অনুসারে কাজ করতে পারি।

৪. অন্য যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন তাদেরকে আমরাও বিষয়টি অবহিত করতে পারি। সাহায্য বা অনুদান করার এ কর্মপরিকল্পনাটি তাদের সঙ্গে বিনিময় করতে পারি। তা ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে হতে পারে, কিংবা লিখিতভাবে, ইমেইলের সাহায্যে, ব্লগে অথবা অন্য কোনো অনলাইনের মাধ্যমে সেটি করা যেতে পারে। আমাদের সকলসময় বেশকিছু বিষয় পরিহার করতে হবে। যেমন, আমি যেটি ভাবছি সেটিই সঠিক এরকম ভাবনা পরিহার করতে হবে। আমাদের ভাবনাই একমাত্র যথার্থ তা ভাবা ঠিক নয় একারণে যে আমরা সবাইতা আর সাধু-সন্ত নই। কেবল আত্মসচেতনতাই আমাদেরকে সমস্যা সমাধানের অংশে পরিণত করতে পারে।

৫. আমরা যদি কোনো কর্পোরেশন অথবা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানকে আমরা প্রভাবিত করতে পারি তারা যেন বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করে। এমনকী আমরাও আয়ের ১% অনুদান হিসেবে রাখতে পারি যা কোনো চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা হবে। পৃথিবীর গরীব জনগণের জন্য তা নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে।

৬. ধনী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানাতে পারেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন এই লক্ষে যেন বিদেশী সাহায্য গরীবদের জন্য ব্যয় করা হয়।

৭. এসব দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারব কারা চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। এমনকী আমরা এটাও প্রচার করতে পারি যে, মানবজাতির মুক্তি অবশ্যই নীতি-

নৈতিকতার প্রভাবে হতে পারে। এভাবেই আমরা সমাধানের অংশ হয়ে উঠতে পারি।

আট

সিঙ্গারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন মডেল: কয়েকটি সমালোচনা

সিঙ্গার উল্লেখ করেন, যিশু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যখন গরীবকে সাহায্য করি তা যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়। সাহায্য এতো গোপনে করতে হবে যেন তোমার ডান হাত যা করছে বাম হাত যেন তা জানতে না পারে। এটির পুরষ্কার পাওয়া যাবে পরকালে, ইহকালে নয়। কারণ কোনো ব্যক্তি যদি মানুষ দ্বারা খ্যাতি বা সম্মান পাবার জন্য দান-দাক্ষিণ্য করে নিজের মান-মর্যাদা বাড়াতে চায় তাহলে তারা কখনো প্রকৃত অর্থে বিনয়ী বা দানকারী নয়। অনেক সময় ব্যক্তিগণ যখন লোক দেখানোর জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ অনুদান বা সাহায্য দান করে তা মূলত নিজেদেরকে মানবতাবাদী কিংবা তারা যে ধনী এবিষয়টি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য করে থাকে। কিন্তু, এসব কী দান বা সাহায্যের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। দান বা সাহায্য সেটি ব্যক্তি যে পর্যায় থেকে কিংবা যে মনোভাব থেকে করুক না কেন এটা কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। দান দানই। সেটা হোক আত্মপ্রচারের জন্য, কিংবা ধর্মীয় অনুভূতি থেকে।

পিটার সিঙ্গার দারিদ্র্যকে সাহায্য করার জন্য যে নৈতিক ও নীতিগত প্রস্তাব করেছেন তা কী যুক্তিযুক্ত কয়েকটি দিক থেকে আমরা উপর্যুক্ত প্রশ্নটিকে বিবেচনা করতে পারি। নানা যুক্তি দেখিয়ে সিঙ্গারের যুক্তিটিকে খন্ডন করা যেতে পারে। প্রথমেই আমরা তাঁর যুক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে পারি পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় বিভিন্ন সংগঠন কাজ করছে।ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল তন্মধ্যে একটি। এই সংস্থাটির কাজ হলো গোটা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের সুপ্রশাসন নীতির মাত্রা অনুসারে তালিকা প্রণয়ন করা। প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সুশাসনের দিক থেকে কোন রাষ্ট্রটির অবস্থান কী সেটি নির্ধারণ করাই এর কাজ। তন্মধ্যে দুর্নীতি, সুশাসন ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের দিক থেকে অধোগতির রাষ্ট্রসমূহ থাকে তালিকার শীর্ষে। দুর্নীতির তালিকায় শীর্ষে থাকা রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য সংস্থাসমূহকে যদি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে অনুদান দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় তার যথার্থ প্রয়োগ অপেক্ষা অপপ্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে ধরা যাক, বিভিন্ন পর্যায় থেকে অভিযোগ উঠছে বিদেশী সাহায্যসমূহ যথার্থভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এরকম বাস্তবতায় সাহায্য বা অনুদান বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ কতোটা সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্যদিকে বণ্টনের ক্ষেত্রেও অবিচার দুর্নীর্তিতে শীর্ষে অবস্থানকারী রাষ্ট্রসমূহের আরেকটি সমস্যা। এরকম বিবেচনায় সাহায্যকারী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান কার্যত একটি ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হবে।

---

54 Singer, 2009, pp. 168-9.

55 Singer, 2009, pp. 168-9.

পিটার সিঙ্গার তাঁর যুক্তিতে দাবি করছেন অনুদান করার জন্য যে কোনো আত্মত্যাগকে অপেক্ষাকৃত নিকটতম জরুরি (nearly as important) হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। কিন্তু, এ পরিভাষাটি দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা অনেকটা দ্ব্যর্থক। যদিও তিনি ভেবেছেন, যে জনগোষ্ঠী সৎ তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন, ন্যায়বিচার করবেন এটাই স্বাভাবিক। সিঙ্গার একটি ক্ষেত্রে খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, "যুক্তিটি বিতর্কিত হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি নিজের কাজে দায়িত্বশীল হই, ন্যায় হই, তাহলে আমাদের জীবন যাপন থেকে সবকিছুই নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিতত হয়ে যাবে।" সিঙ্গারের এ যুক্তির যথেষ্ট ফলপ্রসু আবেদন রয়েছে। কারণ তাঁর যুক্তিটির মূলকথা হলো আমরা যেন অতিরিক্ত খরচ না করি, এমনকিছু যেন না কিনি যা আমাদের প্রয়োজন নেই। উদ্বৃত্ত খরচ (surplus spending) এবং যার প্রকৃত প্রয়োজন নেই সেরকম বিলাসী দ্রব্য ক্রয়ের বাহুল্য বর্জন করাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত।

সিঙ্গারের উপর্যুক্ত যুক্তি থেকে আমরা একটি বিষয় অনুমান করতে পারি, এটি সম্ভব কতোগুলো শর্তের মধ্যে :

১.অপরের ক্ষতি করা যাবে না,

২. জনগণকে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে,

৩. কারো সঙ্গে প্রতারণা করা যাবে না,

৪. কোনো অবস্থা সম্পর্কে কাউকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া যাবে না,

৫. বৃদ্ধ পিতামাতা ও শিশু-সন্তানাদির প্রতি সহযোগিতার মনোভাব অব্যাহত রাখতে হবে,

৬. নিকটস্থ গোষ্ঠী বা সমাজের যেসব সদস্য অপেক্ষাকৃত অভাবী তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। মানবতা ও মঙ্গলের লক্ষ্য কাজ করতে হবে।

যদি কেউ "মানুষ দ্বারা সম্মানিত হবে" এই নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, কিংবা সাহায্য করা একটি বদান্যতার বিষয় তা দেখানোর জন্য সাহায্য করেন, তাহলে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ হবে। প্রকৃত অর্থে হয়তো সাহায্যকারীর মনোভাবে সেরকম বদান্যতা নেই। এজন্য বলা হয় আত্মপ্রচার কিংবা সামাজিক মানমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করার প্রবণতায় কিছু মন্দ দিক রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক চর্চায় ভোটবাণিজ্যের সঙ্গে এরকম সাহায্য সহযোগিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বুর্জোয়া ঘরানার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনী এলাকায় নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করে থাকে। এই সাহায্যের পেছনে প্রত্যাশা থাকে গরীব জনগণ তাকে ভোট প্রদান করবে কিংবা রাজনৈতিকভাবে সহযোগিতা করবে। নামমাত্র সহযোগিতা গরীব জনগোষ্ঠীর স্থায়ী দারিদ্র্য দূর করতে ভূমিকা রাখে না। কিন্তু, এতে করে গণতান্ত্রিক পরিবেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতিও এসে যুক্ত হচ্ছে। যেমন, প্রাপ্ত সাহায্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভোট পাবার প্রত্যাশা যুক্ত হয়। এই প্রত্যাশা সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে ভোটপ্রদানের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাপ সৃষ্টি

করে থাকে। ফলে গ্রহীতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দান বা সহযোগিতা করার সামর্থ্যও নির্বাচনী গণতন্ত্রে পরোক্ষ ভাবে একটি শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। একারণে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা যোগ্য, সৎ ও প্রতিশ্রুতিবান নাগরিকগণ নির্বাচনী গণতন্ত্রে সফল হতে পারছেন না। আর ধনী কিংবা ব্যবসায়ী শ্রেণী এ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাবার ফলে রাজনীতিতে প্রকৃত রাজনীতিবিদ অপেক্ষা ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা ব্যবসায়িক সুবিধা পাবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে। এজন্য সাহায্য করার রীতি তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য একটি ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা হয়েও দাঁড়িয়েছে।

সাহায্য করার নীতির বিরুদ্ধে আমরা আরো কয়েকটি সমালোচনা দাঁড় করাতে পারি। আপাতত মনে হচ্ছে সিঙ্গার যিশুর বাণীকে গুরুত্ব দিয়ে সাহায্যকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছেন। যেমন যিশু বলছেন, "তোমার আলো অন্যের জন্য জ্বলতে দাও। এই লক্ষে তুমি তা করো যেন তোমার মহৎ কর্ম যেন স্বর্গের পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।" আবার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি বা সামাজিক মানমর্যাদা অর্জনের জন্যও অনেকে সাহায্য করে থাকেন। তবে উভয়ের মধ্যে স্পষ্টত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যে সিঙ্গার যে প্রস্তাব করেছেন তাতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিংবা, দান করার মানসিকতা ও সামাজিক মর্যাদা লাভ উভয়ই একাকার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাহায্য করার বিষয়টি ঈশ্বরের নিমিত্তে, মানুষকে সম্মানিত করার লক্ষ্য নয়। এখান থেকে আমরা দ্বিতীয় যে সমালোচনাটি পাই তা লক্ষ করা যাক: নিশ্চয়ই আমরা দু'ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। ব্যক্তির কাজের মধ্যে তার ভালোত্ব নির্ধারণ করতে পারি। আবার ঐ কাজের স্বনিহিত দিক থেকেও কাজের নৈতিক অবস্থা (moral status) নিরূপণ করতে পারি। ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে থাকা ভালোত্ব আর কোনো একটি কাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভালোত্ব এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যাক। একজন ব্যক্তি যিনি "সাহায্য করার মতো ভালো কাজ" করছেন নিজের প্রভাব ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য, অথচ ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভালো নয়। আবার কেউ সাহায্য করছেন এ কাজের মধ্য দিয়ে সে কোনো ফল বা বিনিময় খোঁজবার চেষ্টা করছেন না, বরং সাহায্য করাকে নৈতিক মনে করে করছেন। নিঃসন্দেহে এধরনের সাহায্য স্বনিহিত অর্থে ভালো কাজে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু প্রথমজনের সাহায্য সেরকম অর্থে স্বনিহিত মূল্য নেই। সুতরাং সাহায্যেও পরিপ্রেক্ষিতের কারণে দু'রকম অর্থ দিচ্ছে।

সিঙ্গার যে নৈতিক মডেলের প্রস্তাব করছেন তার আরো কিছু সীমাবদ্ধতা আমরা

---

56 Singer, 2009, p. 17.
57 Matthew 5:16, NRSV.

উল্লেখ করতে পারি। যেমন, তিনি গরীব ও ক্ষুধার্তকে সাহায্য করার বিষয়টি যতোটা জোর দিয়ে বলছেন, সেই গরীব ও ক্ষুধার্ত মানুষকে স্বাবলম্বী হবার জন্য কোনো পরামর্শ তিনি সেভাবে করছেন না। এ ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেন-এর সক্ষমতা তত্ত্বটি আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি নানাভাবে অনুসন্ধান করেছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বড় কারণ খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদির উপর জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের অসামর্থ্য। তিনি বলেছেন, "স্বত্ত্বাধিকারের ব্যর্থতা" (failure of entitlement) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ। এই ব্যর্থতা সৃষ্টি হয় দু'ভাবে :

প্রথমত, জনগোষ্ঠীর মধ্যে সক্ষমতার (capability) অভাবে,

দ্বিতীয়ত, সামাজিক অবিচারের কারণে।

উপর্যুক্ত দুই ত্রাসকে যদি চিহ্নিত করা যায় তবেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা আনা সম্ভব। কিন্তু, সিঙ্গারের নৈতিক মডেল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের পেছনে লুকানো এই কারণকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায়ে তার সাহায্য ও নৈতিক সমৃদ্ধি মতবাদ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

সিঙ্গার যে নৈতিক মডেলের কথা বলেছেন, তা আরো কিছু প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন তৃতীয় বিশ্বের অনেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অর্থনৈতিক সার্মর্থ্যের পেছনে রয়েছে জনগণের প্রতি অবিচার ও বঞ্চনার মতো অনৈতিক কর্মকান্ড। যেমন বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণিদের তালিকা করলে দেখা যাবে করফাঁকি, শিল্পঋণের নামে ব্যাংকের অর্থ লুটপাটের ঘটনা রয়েছে। ধনী হবার পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে পোষাক শিল্পসহ বেশকিছু শিল্পে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে, অথবা অন্যকোনো অনিয়মের মাধ্যমে। অথচ নিয়মতান্ত্রিক অর্থবাজার বজায় রাখলে মানুষের জীবন যাপনের উৎস সমূহে নিয়ন্ত্রণ থাকতো। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রকট আকার ধারণ করত না। আবার স্বাবলম্বী কিংবা বিত্তবানদের সাহায্য নিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কতোটা দূর করা সম্ভাব। অনৈতিক ও অবিচারের মধ্য দিয়ে যারা ধনী হয় তাদেরকে যদি আমরা নৈতিক দায়বদ্ধতা শেখাতে যাই তা হবে হাস্যকর। দায়বদ্ধতার কারণে তারা গরীবদের সাহায্য করবে এরকম ভাবনা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ে ফ্যান্টাসি করার সামিল।

উপযোগবাদী হিসেবে সিঙ্গার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে ক্লেশ ও যন্ত্রণা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর এ বক্তব্যও নতুন প্রশ্নের উদ্রেক করে। কোনো ক্লেশ বা যন্ত্রণা প্রতিকার করা নৈতিক। একইভাবে কাউকে ক্লেশের শিকার হতে দেওয়া কিংবা দীর্ঘস্থায়ী ক্লেশের শিকার হতে দেওয়া উভয়ই মন্দ ও অনৈতিক। এ দুটিই আমাদের প্রতিকার করা উচিত। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সিঙ্গার বলছেন, ক্ষুধা একইসঙ্গে রোগ ও দারিদ্র্য মানব ক্লেশ ও যন্ত্রণার জন্য দায়ী, আবার কখনো তা মৃত্যুরও কারণ। এজন্য সিঙ্গার প্রদত্ত নীতিটিকে আমরা একটি মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কারণ একজন ব্যক্তির সুখ বা অতি ভোগবাদী ভাবনা পরিহার করার ফলে যদি কারো ক্ষুধাও দারিদ্র্যের মতো ক্লেশ বিমোচন

করা যায় তাহলে আমাদের তাই করা উচিত। যদি কোনো ক্ষুধার্ত বা দরিদ্রজনের বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বা প্রতিকারে কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সামর্থ্য না থাকে তাহলে আমরা যারা স্বচ্ছল তাদের নিকট প্রত্যাশা করব একাজে এগিয়ে আসবার জন্য।

কিন্তু, সিঙ্গারের প্রস্তাবনার কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাও আমাদের বিবেচনা রাখা উচিত। এরকম কয়েকটি দিক নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। প্রথমত, সিঙ্গার ক্ষুধাও দারিদ্র্যের কুফলকে ক্লেশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু, ক্লেশই কি ক্ষুধাও দারিদ্র্যের একমাত্র প্রতিফল। এর সঙ্গে ব্যক্তির বৌদ্ধিক সত্তা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যক্তির মর্যাদাবোধের স্খলন ঘটে তাকে কি আমরা তুচ্ছ করে দেখব। অন্যদিকে ক্ষুধাও দারিদ্র্য স্বনিহিত অর্থে যে মন্দ তাও বিবেচনায় রাখা অবশ্যক। কেউ যদি মনে করেন কেবল কর্তব্যবোধই মৃত্যুকে প্রতিকার করতে সক্ষম তাদের দাবি মূলত "ক্ষুধা মন্দ" নীতির মতো সংকীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, আমাদের মনে রাখতে হবে ক্ষুধা মন্দ একারণে যে তা জীবিত মানুষের মধ্যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে থাকে, এটি ক্লেশেরও কারণ পাশাপাশি ব্যক্তির শারীরিক দুর্বলতা ও অমর্যাদারও কারণ। এজন্য ক্ষুধাও দারিদ্র্যকে মন্দ বিবেচনা করে তাকে নৈতিক কর্তব্যবোধের মাধ্যমে প্রতিকার করার গোটা বিষয়টি ভুল প্রকল্পের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বরং ব্যক্তির যন্ত্রণা/ ক্লেশ প্রতিকার করতে হবে একারণে যে এই প্রতিকারের সঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তর মঙ্গল সম্পৃক্ত। আবার যেসব জনগণ অভাবে রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত একারণে যে তারা প্রকৃতই অভাবে রয়েছে। কিন্তু যারা সাহায্য করে না তাদের তুলনায় যারা সাহায্য করে এ তুলনাটি পৃথিবীর মঙ্গলের ধারণায় কোনো প্রভাব ফেলছে এমনটিও নয়।

গরীব ও ক্ষুধার্তকে সাহায্য করা মানব মনস্তত্ত্বের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কারণেই সম্ভব। মানুষের মধ্যে রয়েছে পরোপকার মানসিকতা, উদারতা, সহানুভূতি, সাহায্য, প্রেম ও সেবা। এটাও সঠিক,যে, প্রত্যেক নৈতিক মতবাদই অন্যদের সেবা ও পরিচর্যা করার কর্তব্য নীতির কথা বলে। এই নীতিসমূহ বিশেষ কিছু আত্মীয়তার সম্পর্কের (যেমন, ভাই বোন, পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং সহকর্মী) বাইরেও এই কর্তব্য পালন করার নৈতিক বাধ্যবাধকতার দাবি করে থাকে। আবার কাউকে মন্দ থাকতে দিব না এরকম দায়িত্ববোধও ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রতিকারে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কিন্তু পিটার সিঙ্গার তাঁর নৈতিক তত্ত্বে যে পরামর্শ দেন তাহলো "তুমি যতোটুকু পারো" (as much as you can) নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এটি অনেকটা "আত্ম-উৎসর্গের র‍্যাডিকেল নীতিবিদ্যার" উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন হলো তাহলে আমরা কীভাবে ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচন করব। এ প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয় বিবেচনা করতে পারি:

এক. যাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে (যেমন, শিশু, স্ত্রী-স্বামী, সন্তান, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, নিকট বন্ধুজন এবং গোত্রের সদস্য ইত্যাদি) তারা বিশেষ কারণে যত্ন ও পরিচর্যায় অগ্রাধিকার পাবে।

দুই. আমাদের অধিকার রয়েছে (কেউ হয়তো বলতে পারেন আমার নিজের প্রতি কর্তব্য) আমাদের নিজেদেও স্বার্থ সিদ্ধি করা। আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হওয়া, কোনোপ্রকার প্রবণতা ব্যতিরেকেই আমাদের নিজেদের আনন্দের জন্য কাজ করা।

ফিসকিন এটিকে বলেছেন, "a robust zone of indifference"। এ দ্বারা তিনি বোঝচ্ছেন, আমরা যা কিছু করি তা নৈতিকভাবে সমর্থিতও নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়। আবার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : "যত্ন/পরিচর্যা সম্পর্কিত কর্তব্য" এবং "মানব-কল্যাণ" । এ দুটিতে আমরা অবদান রাখতে পারি। কিন্তু, কোনো নীতিতেই সুনির্দিষ্ট কোনো পরামর্শ নেই যে আমাদেরকে একাজটি এভাবে করতে হবে। কোনো ব্যক্তি কোন কাজটি কীভাবে করবেন তার পেছনে অনেক ধরনের উপাদান রয়েছে, যেমন, ব্যক্তির সহনশীলতা, পরিবেশ পরিস্থিতি, জ্ঞান, সম্পূরক ভাবনা এবং অন্যদের নিকট থেকে আমরা কি ধরনের সাহায্য পাচ্ছি তাও বিবেচ্য বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন স্বচ্ছল ব্যক্তির ইচ্ছা হলো অনেক দাম দিয়ে একটি স্পোর্টস গাড়ী কেনার জন্য। এখন অনেকেই হয়তো বলতে পারেন, গাড়ী কেনার জন্য তিনি এতো টাকা ব্যয় না করে ক্ষুধা দারিদ্র্য প্রতিকারে তিনি তা দান করতে পারতেন। কিন্তু ব্যক্তির যে পছন্দ ও মানসিক আকর্ষণ সেটার কী তাহলে কোনো মূল্য দিব না। এ বিষয়টিও কিন্তু বিবেচনার অংশ হিসেবে রাখতে হবে। তাহলে সিঙ্গারের প্রস্তাবিত মডেলে যে ত্রুটি রয়েছে কীভাবে আমরা তা দুর করতে পারি। এ পর্যায়ে আমি ত্রিমাত্রিক মডেল এর প্রস্তাবনা করব। এই মডেলটি এমনভাবে কাজ করবে একদিকে এটি গরীব ও ক্ষুধার্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে ধনীদের সাহায্য করার নৈতিক দায়বোধ করার পাশাপাশি অর্থনেতিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা খুব জরুরি। এই তিনটি দিকের উপর গুরুত্ব দি আমরা মডেলটির প্রস্তাবনা করছি:

ডায়াগ্রাম ৭ : ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনের ত্রিমাত্রিক মডেল

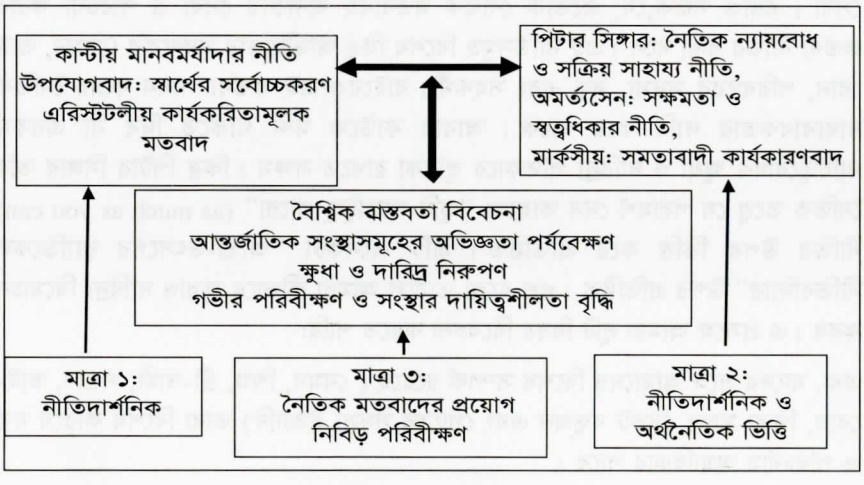

ত্রিমাত্রিক মডেলের প্রথম মাত্রায় ভূমিকা রাখকে নৈতিক নীতি ও মতবাদ, দ্বিতীয় মাত্রায় পিটার সিঙ্গার, অমর্ত্য সেন ও মার্কসীয় সমতাবাদী নীতি, তৃতীয় মাত্রায় এসব নীতির সমন্বয়ে অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বাস্তবতায় প্রয়োগ ঘটানো। এ বাস্তবতায় নৈতিক নীতির অনুশীলন যেমন থাকবে, তেমনি এসব নীতি প্রয়োগে যথাযথ পরিবীক্ষু রয়েছে কি-না তাও গুরুত্ব দেওয়া হবে। ত্রিমাত্রা গ্রহণ করার পেছনে আমরা বিবেচনায় রেখেছি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বৈশ্বিক বাস্তবতাকে। এটি বিচ্ছিন্ন কিংবা অঞ্চলভিত্তিক কোনো ইস্যু নয়। গোটা বিশ্বেও অর্থনৈতিক নীতি ও জীবনাচরণের সঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য যুক্ত। মডেলটির বিস্তারিত নিচের ডায়াগ্রামে উপস্থাপন করা হলো :

ডায়াগ্রাম ৮: নৈতিকতার ত্রিমাত্রিক মডেল

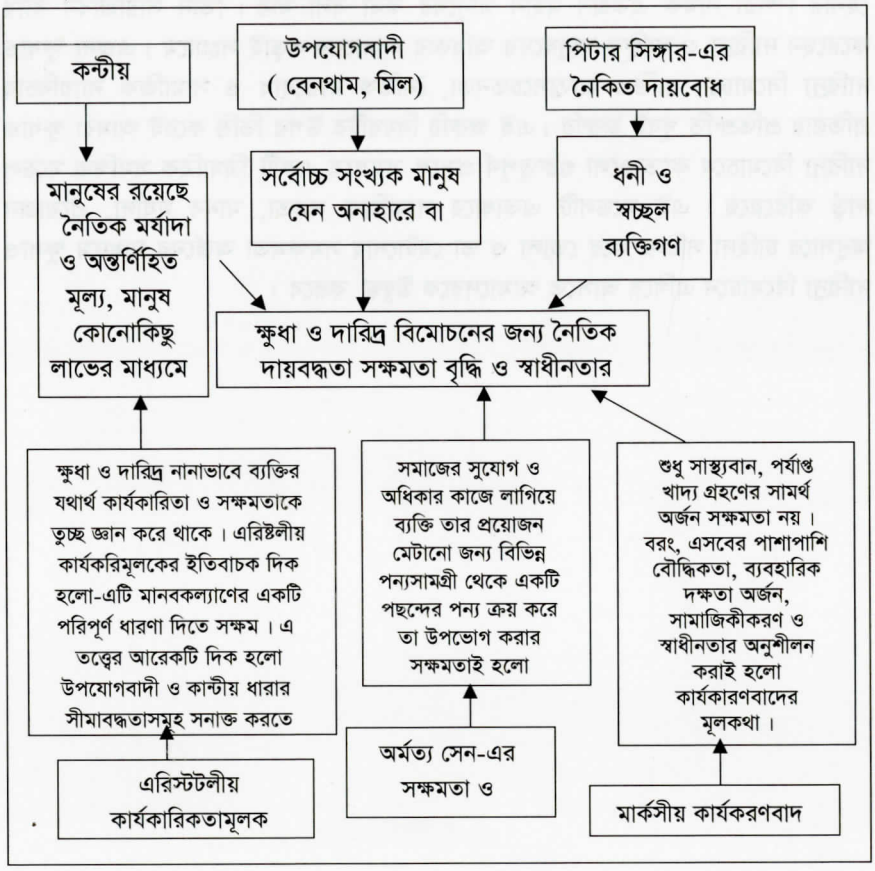

উপসংহার

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে পিটার সিঙ্গার-এর The Life You Can Save we বিস্তৃত নির্দেশনা দেখিয়েছেন। অর্থনেতিক দর্শনের জন্য এটি উৎকৃষ্ট কৌশলও বলা যায়। চরম দারিদ্র্য

বিমোচনে আমাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে সিঙ্গারের যুক্তিসম্বলিত এ গ্রন্থটিতে চিন্তার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। অবশ্যই আমরাও সিঙ্গার-এর মতো বিশ্বাস করি জীবন হবে উচুঁ, আশা প্রত্যাশায় ভরপুর মানবিক জীবন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তার যথার্থ প্রতিফলনও মানুষজন উপভোগ করবে। তবে এটাও ঠিক শুধু বিত্তবানরা নৈতিক হলে, কিংবা ধনী রাষ্ট্রসমূহ তাদের আয়ের ক্ষুদ্র শতাংশ যদি ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রদের জন্য ব্যায় করে তাহলে পৃথিবীতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকবে না। কিন্তু, যাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নেই, তাদের কী কিছুই করার নেই। যারা ক্ষুধাও দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে তারা যদি কর্মঠ হবার চেষ্টা চালায়, কিংবা বোদ্ধা ও বিজ্ঞজনদের প্রণীত ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল অনুসরণ করে তাহলেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে হেনরি স্পিরা নামক একজন মহান মানুষের কথা বলা যায়। তিনি সারাজীবন ব্যায় করেছেন দারিদ্র্য ও লাঞ্ছিত মানুষদের অধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামে। এজন্য ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যক্তির আত্মসচেতনতা, নৈতিক দায়বোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি খুবই জরুরি। এই জরুরি বিষয়টির উপর ভিত্তি করেই আমরা ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে সমন্বয়ে একটি ত্রিমাত্রিক সমন্বিত মডেল দাড়ঁ করিয়েছে। এই মডেলটি একাধারে সামাজিক সমতা, মানব মর্যাদা, প্রয়োজন অনুসারে চাহিদা সক্রিয় করে তোলা ও তা মেটানোর সমক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে এগিয়ে আসতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে।